পাগলা গণেশ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

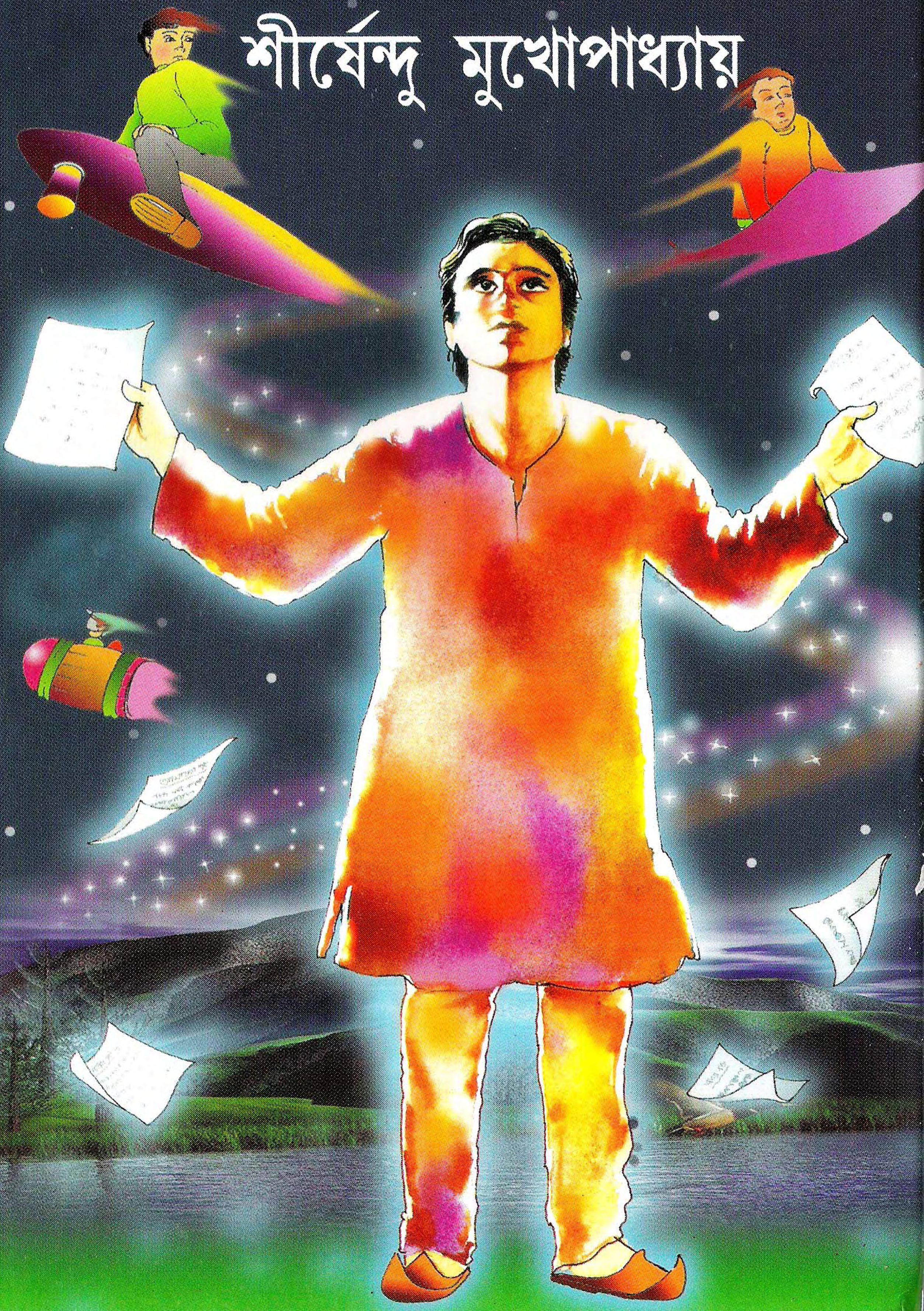

পাগলা গণেশ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

PAGLA GANESH
A Collection of Bengali stories *by* SIRSHENDU MUKHOPADHYAY
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
email : deyspublishing@hotmail.com
₹ 50.00

ISBN 81-295-0221-6

প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা
জানুয়ারি ২০০৫, মাঘ ১৪১১
তৃতীয় সংস্করণ জুন ২০১১, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ প্রবীরকুমার সামন্ত

৫০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

রাঃ স্বাঃ

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

শ্রীসলিল গুপ্ত
শ্রীমতী আলো গুপ্ত
করকমলেষু

লেখকের অন্যান্য বই

পদক্ষেপ
কাছের ঠাকুর
হরিপুরের হরেক কাণ্ড
বাঙালের আমেরিকা দর্শন
একাদশীর ভূত
ওয়ারিশ
চারদিক
গোলমাল
আক্রান্ত
ফেরীঘাট
মাধুর জন্য
জোড় বিজোড়
বড়সাহেব
অদ্ভুতুড়ে
শ্রেষ্ঠ গল্প
গল্পসমগ্র (১ম) (২য়) (৩য়)

সূচি

পাগলা গণেশ	৯
গোপেনবাবু	১৫
ভগবানের আবির্ভাব	২০
গন্ধটা খুব সন্দেহজনক	২৬
ঘুড়ি ও দৈববাণী	৩৫
সংবর্ধনা	৪০
ফটিকের কেরামতি	৪৫
কৃপণ	৫২
পরশি	৫৮
দিনকাল	৬৪
সময় সরণী	৬৯
আশ্চর্য অলিম্পিক	৭৫
সাতপুরার হাট	৮২
গুপ্তধন	৮৭
হনুমান ও নিবারণ	৯২
উল্কা ও ষষ্ঠিচরণ	৯৯
কিছুক্ষণ	১০৬

পাগলা গণেশ

মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধকারী মলম আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে পৃথিবীতে নানারকম উড়ান যন্ত্র আবিষ্কারের একটা খুব হিড়িক পড়ে গেছে। কেউ ডাইনীদের বাহন ডাণ্ডাওলা ঝাঁটার মতো, কেউ নারদের ঢেঁকির মতো, কেউ কার্পেটের মতো, কেউ কার্তিকের বাহন ময়ূরের মতো উড়ান যন্ত্র আবিষ্কার করে তাতে চড়ে বিষয়কর্মে যাতায়াত করছে।

আকাশে তাই সব সময়েই নানারকম জিনিস উড়তে দেখা যায়।

এমনকি কৃত্রিম পাখনাওলা মানুষকেও।

সালটা ৩৫৮৯। ইতিমধ্যে চাঁদ, মঙ্গল এবং শুক্রগ্রহে মানুষ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে, সূর্যের আরও দুটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং জানা গেছে আর কোনও গ্রহ নেই, মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে হাজার হাজার মানুষ আলোর চেয়েও গতিবেগসম্পন্ন মহাকাশযানে রওনা হয়ে গেছে এক দেড়শো বছর আগে থেকে এবং এখনও অনেকে যাচ্ছে। কাছেপিঠে যারা গেছে তাদের ফেরার সময় হয়ে এল। তবে সেটা এক মিনিট পর না একশো বছর পর তা জানবার উপায় নেই।

তা বলে পৃথিবীর মানুষেরা হাল ছাড়েনি।

সেই এক দেড়শো বছর আগে যারা জন্মেছিল তারা সকলেই সশরীরে বর্তমান। আজকাল পৃথিবীতে মানুষ মরে না। যারা মহাকাশে গেছে তারা ফিরে এসে সেই আমলের লোকেদের দেখতে পাবে। তবে সব মানুষই বেঁচে আছে বলে নতুন মানুষের জন্মও আর হচ্ছে না। গত দেড়শো বছরের মধ্যে কেউ পৃথিবীতে শিশুর কান্না শোনেনি।

এদিকে ঘরে ঘরে মানুষ এত বেশি বিজ্ঞান নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে যে, প্রতিঘরের প্রত্যেকেই কোনও না কোনও বিজ্ঞানের বিজ্ঞানী। বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনও চর্চাই নেই। কবিতা, গান, ছবি আঁকা, কথাসাহিত্য, নাটক, সিনেমা এসব নিয়ে কেউ মাথাই ঘামায় না। ওসব অনাবশ্যক ভাবাবেগ কোনও কাজেই লাগে না।

খামোখা সময় নষ্ট।

খেলাধুলোর পাটও চুকে গেছে।

অলিম্পিক উঠে গেছে। বিশ্বকাপ বিলুপ্ত। আছে শুধু বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান।

পূর্ণিমার চাঁদ দেখলে, কোকিলের ডাক শুনলে বা পলাশ ফুল ফুটলে কেউ আর আহা উহু করে না। বর্ষাকালের বৃষ্টি দেখলে কারও মন আর মেদুর হয় না। ওগুলোকে প্রাকৃতিক কার্যকারণ হিসেবেই দেখা হয়।

গোলাপ ফুলের সৌন্দর্যের চেয়ে তার অ্যানালাইসিসটাই বেণি জরুরী। দয়া মায়া করুণা ভালবাসা ইত্যাদিরও প্রয়োজন না থাকায় এবং চর্চার অভাবে মানুষের মনে আর ওসবের উদ্রেক হয় না।

ব্যতিক্রম অবশ্য এক আধজন আছে।

যেমন পাগলা গণেশ। পাগলা গণেশের বয়স দুশো বছর।

পঞ্চাশ বছর বয়সে, অর্থাৎ আজ থেকে দেড়শো বছর আগে মৃত্যুঞ্জয় টনিক আবিষ্কার হয়। গণেশও আর সকলের মতো টনিকটা খেয়েছিল। ফলে তার মৃত্যু বন্ধ হয়ে গেল। দেড়শো বছর আগে যখন সুকুমার শিল্পবিরোধী আন্দোলন শুরু হল এবং শিল্প সঙ্গীত সাহিত্য ইত্যাদির পাট উঠে যেতে লাগল তখন গণেশের ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। তাছাড়া বিজ্ঞানের বাড়াবাড়িও একটা সীমা থাকা দরকার বলে তার মনে হল। গণেশ অনেক চেষ্টা করে যখন দেখল কালের চাকার গতি উল্টোদিকে ফেরানো যাবে না তখন সে সভ্য সমাজ থেকে দূরে থাকার জন্য হিমালয়ের একটি গিরিগুহায় আশ্রয় নিল।

তা বলে হিমালয় যে খুব নির্জন জায়গা তা নয়। এভারেস্টের চূড়া চেঁছে অবজার্ভেটরি হয়েছে, রূপকুণ্ডে বায়োকেমিস্ট্রির ল্যাবরেটারি, কে টু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী, মানস সরোবর সর্বত্রই নানা ধরনের গবেষণাগার। সমুদ্রের তলাতেও চলছে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অর্থাৎ ভূগর্ভে, ভূপৃষ্ঠে এবং অন্তরীক্ষে কোথাও নিপাট নির্জনতা নেই। পৃথিবীর জনসংখ্যা যে খুব বেশি তা নয়। কিন্তু তারা সমস্ত পৃথিবীতে এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে, নির্জনতা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কাজ।

এই তো আজ সকাল থেকে গণেশ বসে কবিতা লিখছে। একটু আগে একটা ঢেঁকি আর একটা ভেলায় চড়ে দুটো লোক এসে বলল, এই যে গণেশবাবু, কী করছেন?

কবিতা লিখছি।

কবিতা? হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ। তা আপনার কবিতা শুনছেই বা কে আর পড়ছেই বা কে?

আকাশ শুনছে, বাতাস শুনছে, প্রকৃতি শুনছে। কবিতার পাতা বাতাসে ভাসিয়ে দিচ্ছি। যদি কেউ কুড়িয়ে পায় আর পড়তে ইচ্ছে হয় তো পড়বে।

হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

ক'দিন আগে সন্ধেবেলা গণেশ একদিন গলা ছেড়ে গান গাইছিল। তার গানের

গলা বেশ ভালই।

হঠাৎ দু'টো পাখাওলা লোক লাসা থেকে ইসলামাবাদ যেতে যেতে নেমে এসে রীতিমতো ধমক দিয়ে বলল, ও মশাই, অমন বিকট শব্দ করছেন কেন?

শব্দ কী! এ যে গান!

গান! ওকেই কি গান বলে নাকি! ধুর মশাই, এ যে বিটকেল শব্দ।

একদিন পাহাড়ের গায়ে যান্ত্রিক বাটালি দিয়ে পাথর কেটে ছবি আঁকছিল গণেশ। হঠাৎ একটা ধামা নেমে এল। এক মহিলা খুব আগ্রহের সঙ্গে বলে চলেন, এটা

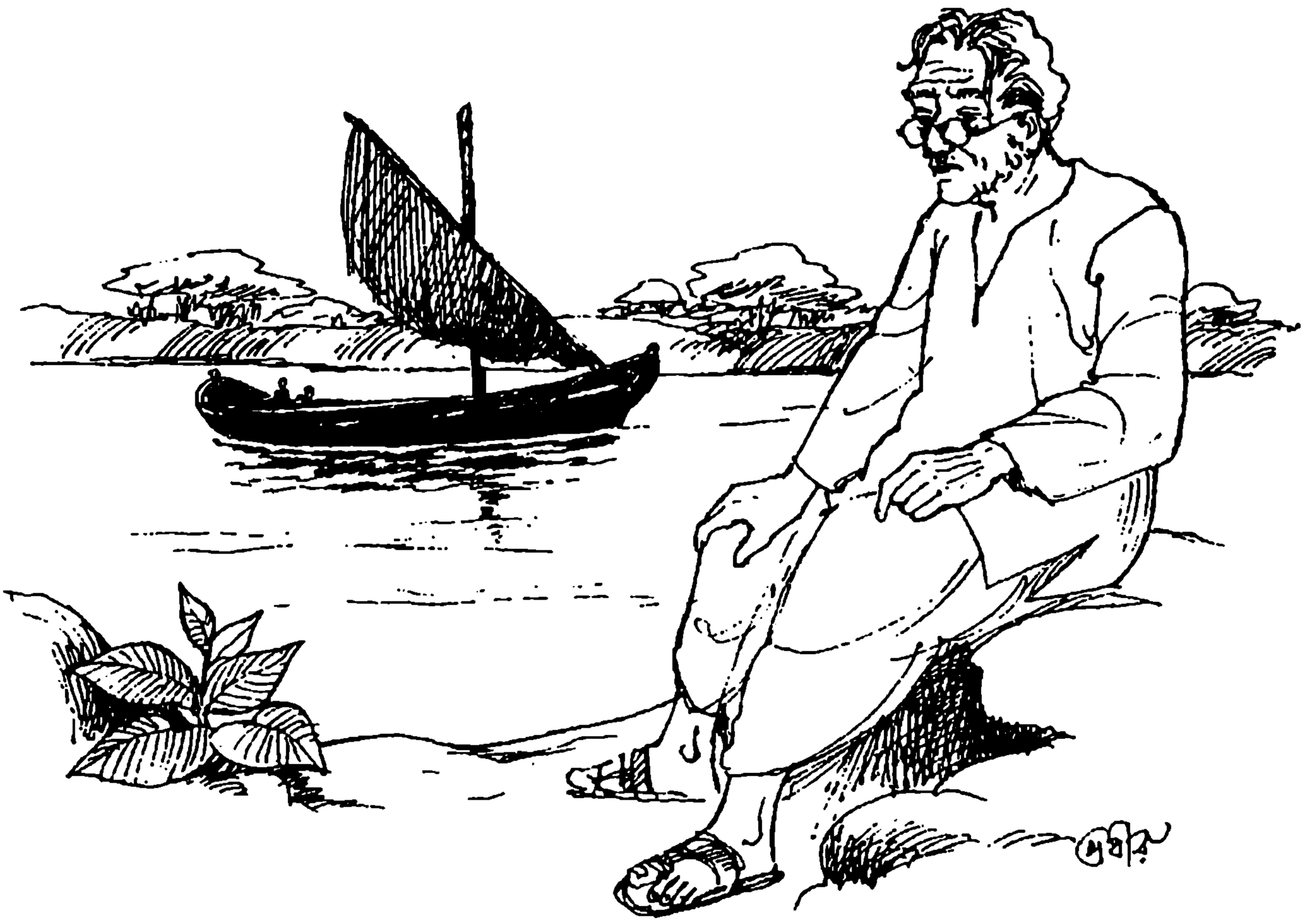

কিসের সার্কিট ডিজাইন বলুন তো। বেশ ইণ্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

ডিজাইন নয়, ছবি। খেয়ালখুশির ছবি।

ভদ্রমহিলা চোখের পলক না ফেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই! ছবি হচ্ছে! হুঁঃ!

গণেশ জানে, একা সে পৃথিবীর গতি কিছুতেই উল্টে দিতে পারবে না। কিন্তু একা বসে বসে যে নিজের মনের মতো কিছু করবে তারও উপায় নেই। এই মৃত্যুহীন জীবন, এই অন্তহীন আয়ু কি এভাবেই যন্ত্রণার মধ্যে কাটাতে হবে? সুইসাইড করে কোনও লাভ নেই। আজকাল মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা শক্ত

কাজ তো নয়ই, বরং পৃথিবীর জনসংখ্যার ভারসাম্য রাখতে তা করা আবশ্যিক।

গণেশের তিন ছেলে, এক মেয়ে। বড় ছেলের বয়স একশো চুয়াত্তর বছর, মেজোর একশো একাত্তর, ছোট ছেলের একশো আটষট্টি এবং মেয়ের বয়স একশো ছেষট্টি। প্রত্যেকেই কৃতী বিজ্ঞানী। তারা অবশ্য বাপের কাছে আসে না। অন্তত গত একশো বছরের মধ্যে নয়। গণেশ তাদের মুখশ্রী ভুলে গেছে। গণেশের স্ত্রী ক্যালিফোর্নিয়া মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করতেন, দেড়শো বছর আগে তিনি অ্যান্ড্রামিডা নক্ষত্রপুঞ্জে রওনা হয়ে যান। এখনও ফেরেননি।

আজ সকালে গণেশকে কবিতায় পেয়েছে। কবিতা লিখছে আর ভাসিয়ে দিচ্ছে বাতাসে। কবিতার কাগজগুলো বাতাসে কাটা ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছে, ঘুরছে ফিরছে, ভাসছে, পাক খাচ্ছে, তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে অনেক দূর। প্রতিদিন যত কবিতা লিখেছে গণেশ সবই এইভাবে ভাসিয়ে দিয়েছে। যদি কারও কাছে পৌঁছোয়, যদি কেউ পড়ে।

আকাশে একটা পিপে ভাসছিল। গণেশ লক্ষ্য করেনি। পিপেটা ধীরে ধীরে নেমে এল। নামল একজন পুলিশম্যান। গণেশকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বলল, স্যার, এককালে আপনি যখন কলকাতার সায়েন্স কলেজে মাইক্রোইলেকট্রনিক্স পড়াতেন তখন আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। কিন্তু এসব আপনি কী করছেন? পাহাড়ময় কাগজ ছড়াচ্ছেন কেন? এটা কি নতুন ধরনের কোনও গবেষণা?

গণেশ মাথা নাড়ল, না হে না, ওসব গবেষণা-টবেষণা আমি ভুলে গেছি। আমি পৃথিবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।

তার মানে? পৃথিবী তো দিব্যি বেঁচে আছে। মরার কোনও লক্ষণই নেই।

মরছে। পৃথিবী মরছে। পরে টের পাবে।

এ কাগজগুলো কি কোনও প্রেসক্রিপশন? পৃথিবীর বাঁচবার ওষুধ?

ঠিক তাই। ওগুলো কবিতা। তুমি পড়ে দেখতে পারো।

লোকটা মাথার হেলমেট খুলে মাথা চুলকে হতভম্বের মতো বলল, কবিতা!

হ্যাঁ। কবিতা। পড়ো।

লোকটা পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা পাক-খাওয়া কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

কি বুঝলে?

লোকটা অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বলল, কিছু বুঝতে পারছি না স্যার। কোনওদিন এ জিনিস পড়িনি।

তোমার বয়স কত?

একশো একান্ন বছর।

বাচ্চা ছেলে।

আজ্ঞো হ্যাঁ স্যার। আমাদের আমলে শিক্ষানিকেতনে এসব পড়ানো হত না। শুনেছি তারও অনেক আগে কবিতা নামে কী যেন ছিল।

লোকটি নিরীহ এবং ভালমানুষ দেখে গণেশবাবু হুকুমের সুরে বলে উঠল, মনে মনে পড়লে হবে না। জোরে জোরে পড়ো।

লোকটা কাগজটার দিকে চেয়ে থেমে থেমে পড়তে লাগল, গ্রহটি সবুজ ছিল, গাঢ় নীল জল, ফিরোজা আকাশ ... কোকিলের ডাক ছিল, প্রজাপতি, ফুলের সুবাস

আধো আধো বোল ছিল, টলে টলে হাঁটা ছিল, শিশু ভোলানাথ—শৈশব ভাসায়ে জলে, কবি যে বৃহৎ হলে, নামিল আঘাত।—

থামো, বুঝলে কিছু?

লোকটি মাথা নেড়ে বলে, কিছুই বুঝিনি স্যার।

একটুও না?

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, শুধু মনে পড়ছে একসময়ে আমিও টলে টলে হাঁটতে শিখেছিলুম—

গণেশ হতাশ হল। কবিতা তার ভাল হয়নি ঠিকই, কিন্তু না বুঝবার মতো নয়।

লোকটা গণেশকে অভিবাদন করে চলে গেল, যেন একটু ভয়ে ভয়েই।

পরদিন সকালে রোজকার মতো কবিতা লিখতে বসেছে গণেশ। এমন সময় একটা বড়সড় পিপে এসে সামনে নামল।

স্যার।

গণেশ তাকিয়ে দেখে, সেই লোকটি, সঙ্গে দুই মহিলা।

আমার স্ত্রী আর মাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। আমার মা কবিতার ব্যাপারটা খানিকটা জানে। এরা দু'জনেই কবিতা শুনতে চায়।

গণেশ অবাক এবং খুশি দুইই হল। তবে কবিতা শুনিয়েই ছাড়ল না। গান শোনাল, ছবি দেখাল।

তিনজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে রইল।

কিছু বুঝতে পারছো তোমরা?

তিনজনেই মাথা নেড়ে জানাল, না!

লোকটা বিনীত ভাবেই বলল, না বুঝলেও আমার মধ্যে কী যেন একটা হচ্ছে।

কী হচ্ছে?

ঠিক বোঝাতে পারব না।

পরদিন লোকটা ফের এল। সঙ্গে আরও চারজন পুলিশম্যান।

এরা স্যার আমার সহকর্মী, কবিতা গান ছবির ব্যাপারটা বুঝতে চায়।

গণেশ খুব খুশি, বোসো বোসো।

পাঁচজন শ্রোতা ও দর্শক ঘণ্টা দুই ধরে গণেশের কবিতা শুনল, গান শুনল, ছবি দেখল। কেউ ঠাট্টা বিদ্রূপ করল না। গম্ভীর হয়ে রইল।

পরদিন লোকটা এল না। কিন্তু জনা দশেক লোক এল, পুলিশ আছে, বৈজ্ঞানিক আছে, টেকনিশিয়ান আছে।

পরদিন আরও কিছু লোক বাড়ল।

পরদিন আরও।

আরও।

এক সপ্তাহ পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব তাঁর বিমান থেকে নামলেন গণেশের ডেরায়। এ আপনি কী কাণ্ড করেছেন? পৃথিবী যে উচ্ছন্নে গেল। লোকে গান গাইতে লেগেছে, কবিতা মকসো করছে হিজিবিজি ছবি আঁকছে।

গণেশ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বলল, যাঃ, তাহলে আর ভয় নেই। দুনিয়াটা বেঁচে যাবে...

গোপেনবাবু

গোপেনবাবু অতি নিরীহ এবং সজ্জন মানুষ। ধার্মিক বলেও তাঁর বেশ খ্যাতি আছে। তবে গোপেনবাবু নিতান্তই একজন গরিব লোক। একজন বদমেজাজী, হাড়কেপ্পন, সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত মহাজনের গুদামে তিনি হিসেব-রাখা কেরানির কাজ করেন। বেতন খুবই যৎসামান্য। তাতে গোপেনবাবু, তাঁর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী এবং ছেলের পেট চলে না। ইদানীং খরচ বাঁচানোর জন্য গোপেনবাবু খাওয়া এতই কমিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর মাথা আজকাল প্রায়ই ভোঁ-ভোঁ করে, চোখে অন্ধকার দেখেন। নিজের খাওয়া কাটছাঁট করে তিনি তাঁর বৃদ্ধা মা আর ছেলেকে দুটো বেশি ভাত খাওয়ার সুযোগ করে দেন। আর কেউ টের না পেলেও তাঁর স্ত্রী ব্যাপারটা ঠিকই টের পান। বলেন, এত কম খেলে শরীর টিকবে কী করে? গোপেনবাবু ভারী মধুর হেসে বলেন,—আজকাল একটু বয়স হয়েছে তো, তাই আর আগের মতো খেতে পারি না। বড় আইঢাই হয়। এই বলে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে উঠে পড়েন।

অফিসে তাঁর খাটনি প্রচুর। মালপত্র আসছে, যাচ্ছে, সেসব হিসেব রাখা, টাকাপয়সা গোনা এবং খাতায় হিসেব মেলানো। এইসব করতে করতে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যায় অনেক। ধুঁকতে-ধুঁকতে ফিরে পুজোপাট সেরে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে ক্লান্তিতে গভীর ঘুমে তলিয়ে যান। এর ওপর আছে মালিকের ধমক-চমক, শাসানি, কথায়-কথায় মাইনে কেটে নেওয়া বা তাড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো।

মালগুদামের কাজে উপরি পয়সা আছে। যেসব মহাজন মাল সরবরাহ করে তারা তাঁর সঙ্গে 'বন্দোবস্ত' করতে চেয়েছিল। বস্তায় কম মাল দিয়ে বেশি মাল দেখানোর জন্য। কিন্তু গোপেনবাবু হাতজোড় করে বলেছেন, বেশি খেয়ে মরার চেয়ে না খেয়ে মরাটাই আমার বেশি পছন্দ। ওই পাপের পয়সা আমি নিতে পারব না।

গোপেনবাবু যে ভালো লোক তা তাঁর মালিক বদ্রীপ্রসাদ-ও জানে। বদ্রীপ্রসাদের নিয়ম হল কর্মচারীরা দু-তিন বছরের পুরোনো হলেই কোনও ছুতোয় তাকে বিদেয় করে দেওয়া। তার ধারণা পুরোনো হলেই কর্মচারীরা চুরি করতে শুরু করে। একমাত্র গোপেনবাবুকেই বদ্রীপ্রসাদ বকাঝকা করলেও তাড়ায়নি। টানা এগারো বছর গোপেন এখানে চাকরি করছেন।

কিন্তু শেষ অবধি গোপেনবাবুরও শিয়রে শমন এল। বর্ষাকালে একদিন অনেক রাত অবধি বসে গুদামের হিসেব মেলাচ্ছিলেন গোপেনবাবু। হঠাৎ বদ্রীপ্রসাদ তাঁকে ডেকে বলল,—দেখো গোপেন, তুমি ভালো লোক আমি জানি। কিন্তু ভালো লোকদের নিয়ে বিপদ কী জানো? তাদের ভালোমানুষির সুযোগে অন্যেরা গুছিয়ে নিতে পারে। আমি ভাবছি, কদিনের জন্য আমার দেশ রাজস্থানে যাব। তোমার ওপর গুদামের ভার দিয়ে যেতে আমার ভরসা হয় না। ভালো হলেও তুমি শক্তপোক্ত লোক নও। তাই ঠিক করেছি আমার ভাতিজা এখন মাস দুই কাজকর্ম সামলাবে। দু-মাস বাদে ফিরে এসে আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব। তবে এ দুই মাসের মাইনে তুমি পাবে না।

গোপেনবাবুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কিন্তু কী আর করেন। ঘাড় কাত করে বললেন,—তাই হবে।

বদ্রীপ্রসাদ বলল,—কাল থেকেই আমার ভাতিজা চার্জ নেবে। কাল থেকে তোমারও ছুটি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোপেনবাবু হিসেবের খাতা জমা নিয়ে নীরবে বেরিয়ে পড়লেন। প্রতিবাদ বা হাতে-পায়ে ধরা তাঁর স্বভাব নয়। বাইরে অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে তাঁর মনে হল, দু-মাস অনেক লম্বা সময়। এতদিন তিনি বাঁচবেন না, কারণ তাঁর আর বাড়তি সম্বল নেই। তাঁর একমাত্র সম্বল হলেন ভগবান। তা ভগবানের যদি ইচ্ছে হয় তবে তিনি সপরিবারে মরবেন।

মনটা খারাপ বলে তিনি সরাসরি বাড়ি গেলেন না। ভাবলেন, নদীর ধারটায় গিয়ে খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে মাথাটা একটু ঠান্ডা করেন।

তা ওখানকার নদীটা তেমন চওড়া নয়, তবে জলে খুব স্রোত। নদীর ধারটা এই বর্ষার রাতে যেমন অন্ধকার, তেমনি নির্জন। নদীর ধারে একটা গাছের তলায় বসে গোপেনবাবু চুপচাপ অন্ধকারে স্রোতের দিকে চেয়ে রইলেন। বাড়ি গিয়ে সত্যি কথাটা যখন বলবেন তখন কী হবে সেটাই ভেবে তিনি চিন্তিত হচ্ছিলেন। না, ভাগ্যের ওপর তাঁর রাগ নেই, ভগবানের ওপর তাঁর অভিমান নেই, কারও ওপর তাঁর হিংসে নেই, কাউকে তিনি শত্রু বলেও মনে করেন না। যা ঘটে, যা ঘটছে সবই তিনি মেনে নেন।

হঠাৎ দেখলেন, সামনেই নদীর ধার থেকে একটা লোক উঠে আসছে। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি বলেই মনে হল। কিন্তু এত রাতে তো খেয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা! লোকটা নদী দিয়ে এল কী করে?

ভদ্রলোক সোজা তাঁর দিকে আসছেন দেখে গোপেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোক কাছে এসে বললেন,—আচ্ছা বিদ্যেধরপুর কী করে যাওয়া যায় বলুন তো, আমার বিশেষ দরকার। আমার ছেলের আজ বিয়ে। বরযাত্রীরা বর নিয়ে

এগিয়ে গেছে। আমার নৌকোটাই পিছিয়ে পড়েছিল। কিন্তু না গেলেই নয়।

গোপেনবাবু অবাক হয়ে বললেন,—কিন্তু বিদ্যেধরপুর যে অনেক দূর। মাইল দশেক তো হবেই। বাস তো কখন বন্ধ হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে বললেন, সর্বনাশ! আমি না গেলে যে বিয়ে ভেস্তে যাবে। কোনও উপায় হয় না?

গোপেনবাবু একটু ভেবে বললেন,—আমি একটা গুদামে কাজ করি। ভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গে ম্যাটাডরওলাদের জানাশুনা আছে। যদি তাতে যেতে চান তবে ব্যবস্থা হতে পারে।

বাঁচালেন মশাই। এখন ম্যাটাডরই আমার পুষ্পক রথ।

গোপেনবাবুকে সবাই ভারী ভালোবাসে। বাজারের একজন ম্যাটাডরওলাকে গোপেনবাবু গিয়ে বলতেই রাজি হয়ে গেল। ভদ্রলোক ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন। গোপেনবাবু বাড়ি ফিরে এলেন।

পরদিন দুর্বল শরীরে ঘুম থেকে উঠে পুজোপাঠ সেরে একটু চা খেয়ে এক চিলতে বারান্দায় গিয়ে বসে রোদ পোয়াতে লাগলেন। আজ আর কাজে যেতে

হবে না। বদ্রীনাথ এ মাসের মাইনেটাও দিয়ে যায়নি। সুতরাং হাঁড়ি চড়বে কি না কে জানে, বসে-বসে তিনি কালকের লোকটার কথা ভাবতে লাগলেন। লোকটা কি ছেলের বিয়েতে গিয়ে ঠিক সময়ে হাজির হতে পেরেছিল?

বসে-বসে একটু ঢুলুনি এসেছিল গোপেনবাবুর।

হঠাৎ গোপেনবাবু, ও গোপেনবাবু, ডাক শুনে চোখ চাইলেন। সামনে কাল রাতের সেই ভদ্রলোক। দিনের আলোয় দেখা গেল, মানুষটির বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা, সুপুরুষ এবং অমায়িক।

গোপেনবাবু শশব্যস্তে উঠে বললেন,—আপনার ছেলের বিয়ে ঠিকমতো হয়ে গেছে তো?

হ্যাঁ, সব ভালোয়-ভালোয় মিটে গেছে। কিন্তু ম্যাটাডরওলা বলছিল, আপনার নাকি চাকরি গেছে?

আজ্ঞে, ওরকম ঘটনা তো ঘটেই। আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না।

শুনুন মশাই, সম্প্রতি আমার দিদিমা মারা গেছেন। মরার সময় তিনি আমাকে নগদ দশ লাখ টাকা আর বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। টাকাটা পড়ে আছে সিন্দুকে। ভাবছি এই তায়েরগঞ্জে একটা ব্যবসা করব। আপনার মালিক যা করে তাই। পাইকারি মাল বেচাকেনা। ব্যবসা দেখার সময় আমার নেই। তাহেরপুরে আমার নিজের আরও কয়েকটা বড় কারবার আছে। ব্যবসাটা দেখবেন আপনি। শুনেছি আপনি বড় সৎ লোক। আপনি আমার কর্মচারী হবেন না কিন্তু, হবেন ওয়ার্কিং পার্টনার। ব্যবসার সব দায়িত্ব আপনার। শুধু লাভের অর্ধেকটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। টাকা ফেলে রেখে লাভ কী বলুন, কাজে লাগুক। টাকা যত নড়ে, তত বাড়ে।

গোপেনবাবু ভারী লজ্জায় পড়ে আপত্তি করতে লাগলেন। কিন্তু ভদ্রলোক ছাড়লেন না। বললেন,—আমি লোক চিনি মশাই, আমাকে ফেরাতে পারবেন না।

গোপেনবাবু রাজি হলেন, ভদ্রলোক একটা দশ লাখ টাকার চেক কেটে তাঁর হতে দিয়ে বললেন,—আজই বড় একটা গোডাউন ভাড়া নিন।

গোপেনবাবু বদ্রীপ্রসাদের ব্যবসার সব মারপ্যাঁচ জানেন। কর্মচারীদেরও চেনেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর ব্যবসা জাঁকিয়ে উঠল। বদ্রীপ্রসাদের খদ্দেররা এসে ভিড় করতে লাগল গোপেনবাবুর গুদামে।

সেখানেকের মধ্যে টাকার বান ডেকে গেল। কিন্তু গোপেনবাবুর মাথা গরম হল না। শান্তভাবে খুব বিচক্ষণতা আর দক্ষতার সঙ্গে তিনি হাল ধরে রইলেন। ভোগ বিলাসিতার দিকে গেলেন না। অমিতব্যয়ের পথে হাঁটলেন না। সঞ্চয়ে মন দিলেন। ব্যবসা আরও বাড়িয়ে ফেললেন। লাভের অর্ধেক নিয়মিত কৃষ্ণকিশোরবাবুর কাছে পৌঁছে দিতে লাগলেন। সবাই খুশি।

দু-মাস বাদে বদ্রীপ্রসাদ ফিরে নিজের ব্যবসার হাল দেখে মাথা চাপড়াতে লাগল। তার অপদার্থ ভাতিজা ব্যবসা ডুবিয়ে বসে আছে। লোকমুখে গোপেনবাবুর নামডাকও শুনল সে।

একদিন নিজের চোখে গোপেনের ব্যবসা দেখতে এসে বলল,—গোপেন, তুমি আমাকে পিছন থেকে ছুরি মারলে তাহলে?

গোপেনবাবু দুঃখিতভাবে বললেন, না শেঠজি, ছুরি আপনি যে নিজেই নিজেকে মেরে বসে আছেন।

ভগবানের আবির্ভাব

ক্যানসারের ওষুধ যে প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন তা লোহিতাক্ষ নিজেই বুঝতে পারছিলেন। উত্তেজনায় তাঁর বুক কাঁপছিল, তেষ্টা পাচ্ছিল, হাত-পা ঠাণ্ডা আর মাথা গরম হয়ে উঠছিল।

লোহিতাক্ষর সামনে একটা কাচের পাত্র বুনসেন বার্নারের ওপর বসানো। ভিতরে একটা সবুজ তরল টগবগ করে ফুটছে। সবুজ রংটা আরও গাঢ় হয়ে কালচে মেরে এলে তিনি সেটা একটা পিউরিফায়ারের মধ্যে রাখবেন। একটা ফানেলের ভিতর দিয়ে পরিশুদ্ধ তরলটি একটি টেস্টটিউবে এসে জমবে। তারপর আর মাত্র দু'টো পর্যায় থাকবে। ক্যানসারগ্রস্ত একটা ইঁদুর খাঁচায় ধুঁকছে। তার ওপর প্রয়োগ করবেন। কিন্তু ফলাফল কী হবে তা লোহিতাক্ষ জেনে গেছেন। তাঁর একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। সেটা হল, কপালের বাঁ দিকে একটা আব। যখনই তিনি কোন সাফল্যের কাছাকাছি আসেন তখনই ওই আবটার মধ্যে একটা কুড়কুড় শব্দ হয়। ঠিক যেন একটা পোকা। আবের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কুড়কুড় করে আনন্দে গান গায়।

লোহিতাক্ষর আবের মধ্যে পোকাটা এখন কুড়কুড় কুড়কুড় শব্দ করছে। লোহিতাক্ষ যখন সর্দি-কাশির ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন তখনও আবের মধ্যে এরকমই শব্দ হয়েছিল। আর সে কী ওষুধ। চারবার নাম ঝাড়লেই সর্দি সাফ। সেবার সর্দির ওষুধ আবিষ্কারের জন্য তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। ক্যানসারের ওষুধ আবিষ্কারের জন্য অতএব দ্বিতীয়বার নোবেল প্রাইজও তাঁর বাঁধা। আবের ওপর আদর করে একটু হাত বুলিয়ে নিলেন লোহিতাক্ষ।

এমন সময় ল্যাবরেটরির দরজা খুলে বনমালী ঢুকল। বনমালী লোহিতাক্ষর কাজের লোক।

বাইরে দু'জন লোক এয়েছেন।

এই সকালে আবার কে এল?

তা কী জানি। একজন বেঁটে, অন্যজন লম্বা। ভাল লোক বলে মনে হচ্ছে না। যান গিয়ে দেখুন।

ভাল লোক নয় কী করে বুঝলি?

আপনিও বুঝবেন। আমি শুধু কয়েছিনু যে বাবু এখন কাজে ব্যস্ত, দেখা হবে

না, তাইতে প্রায় মারতে এল।

ওঃ তাই বুঝি খারাপ লোক। তা কী চায় তারা?

তা আর জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি। আপনার ভিজিটার, আপনি গিয়ে সামাল দিন।

লোহিতাক্ষা সাধারণত উটকো লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন না। কিন্তু আজ তিনি নিজের সাফল্যের আনন্দে এত ডগমগ যে, বার্নারের তাপটা কমিয়ে উঠে পড়লেন, চল তো গিয়ে দেখি কেমন লোক!

লোহিতাক্ষর বাইরের ঘরে যে দু'জন অপেক্ষা করছিল তারা সুবিধের লোক নয় তা এক নজরেই বোঝা যায়। বেঁটে লোকটা ভীষণ বেঁটে, পাঁচ ফুটের নিচেই হবে। আর তার চেহারা অনেকটা ফুটবলের মতো গোলাকার। লম্বা লোকটি আবার বিসদৃশ রকমের লম্বা এবং দৈত্যের মতোই তার স্বাস্থ্য। মিল একটা জায়গায়। দু'জনের চোখই ভাঁটার মতো জ্বলন্ত। দেখলেই মনে হয়, এরা চোখের ইশারায় মানুষের গলা নামিয়ে দিতে পারে। কোন দেশের লোক তাও বুঝবার উপায় নেই। গায়ের রং তামাটে উজ্জ্বল, মুখও ভাবলেশহীন, চুল কালো। সাহেব, বাঙালি, চীনে সবই হতে পারে।

কী চাই আপনাদের?

বেঁটে লোকটা তার ভাঁটার মতো চোখ দুটোকে আরো গনগনে করে লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে থেকে পরিষ্কার বাংলায় বলল, তুমিই জড়িবুটিওয়ালা লোহিতাক্ষ সেন?

এ কথায় কার না রাগ হয়? নেবেলজয়ী বৈজ্ঞানিক লোহিতাক্ষ বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী। তাঁকে প্রথম পরিচয়ে 'তুমি' করে সম্বোধন আর 'জড়িবুটিওয়ালা' বললে তো তাঁর ক্ষেপে যাওয়ারই কথা। লোহিতাক্ষও ক্ষেপলেন এবং দাঁত কড়মড় করে বললেন, তার মানে? এটা কি ইয়ার্কির জায়গা?

বেঁটে লোকটা একটা মস্ত চুরুট ধরিয়ে এক গাল কটু গন্ধের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, শান্ত হও। তুমি যে একটা মেডেল পেয়েছো তা আমরা জানি।

লোহিতাক্ষ অবাক হয়ে বললেন, মেডেল। কিসের মেডেল?

ওই যে নোবেল প্রাইজ না কী যেন। তা সে যাকগে, তুমি যে ভাল ছেলে তা আমরা জানি।

লোহিতাক্ষ রাগে কাঁপছিলেন বটে, কিন্তু কাঁপতে কাঁপতেও তিনি লক্ষ্য করলেন, বেঁটে লোকটার বাঁ কপালে একটা কালো রঙের জরুল। লোকটা মাঝে মাঝে জরুলটায় হাত দিচ্ছে।

লোহিতাক্ষ বললেন, আপনারা বেরিয়ে যান। আমার বাজে কথায় নষ্ট করার মতো সময় নেই।

বেঁটে লোকটা একটু গা-জ্বালানো হাসি হেসে বলল, কেন, কী এমন রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত আছ হে? অ্যাঁ!

বলেই লোহিতাক্ষর মুখে এক ঝাঁক ধোঁয়া ছেড়ে লোকটা খ্যাক খ্যাক করে অপমানসূচক একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। তারপর বলল, আগেকার লোকেরা ভক্তিশ্রদ্ধা জানত, আর এখনকার তোমরা! ছ্যা, ছ্যা, একটু ভদ্রতাও জান না দেখছি।

এ কথায় লোহিতাক্ষ লোকটাকে খুন করার জন্য পকেটে হাত দিয়ে রিভলবার খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর রিভলবার নেই। কস্মিনকালেও ছিল না।

বেঁটে লোকটা কিন্তু লোহিতাক্ষর মনের কথা টের পেল এবং সঙ্গীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, খেলনাটা দাও তো।

দৈত্যটা একটা রিভলবার বের করে বেঁটের হাতে দিল। আর বেঁটেটা রিভলবারটা নিজের বুকের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপে দিল। ভীষণ একটা শব্দ ও ধোঁয়ার ভিতরে বুলেটটা লোকটার বুকে লেগে ঠং করে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল।

বেঁটে লোকটা খ্যাক খ্যাক করে হেসে বলল, দেখলে তো! বিশ্বাস না হয় নিজেই চেষ্টা করে দেখ। এই নাও রিভলবার। জেনুইন জিনিস, সত্যিকারের গুলিই ভরা আছে।

বলতে বলতে রিভলবারটা এগিয়ে দিল লোকটা।

লোকটা সোফায় গা এলিয়ে বসে আর এক কুণ্ডলী ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আরে লজ্জা কী? চালাও না। আচ্ছা আনাড়ী রে বাবা!

লোহিতাক্ষ রিভলবারটা তুলে দুম করে গুলি করলেন। গুলিটা আগের বারের মতোই লোকটার বুকে লেগে ছিটকে পড়ল।

লোকটা খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে বলল, কী হল হে মেডেল-পাওয়া কম্পাউন্ডার, সুবিধে করতে পারলে? দাও খেলনাটা আমার হাতে দাও। আর শোনো, আমি হচ্ছি ভগবান। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে নেই।

লোহিতাক্ষ রাগে গড়গড় করে বললেন, ভগবানই হোন আর যাই হোন, আপনি অত্যন্ত অভদ্র।

বেঁটে লোকটা আবার হাসতে লাগল। গা জ্বালিয়ে, ভুঁড়ি নাচিয়ে। তারপর বলল, ওরে বাপু, আমার নাম ভগবান নয়, আমিই স্বয়ং ভগবান। যাদের মূর্তি-টুর্তি তোমরা পুজো করো তাদেরই একজন।

লোহিতাক্ষ নাস্তিক লোক। আর নাস্তিক বলেই তাঁর ভগবদ্ভক্ত স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই খুব ঝগড়া করেন। তাঁর স্ত্রী মোটেই তাঁর নাস্তিকতাকে ভাল চোখে দেখেন না।

লোহিতাক্ষ লোকটার দিকে চেয়ে ঠাট্টার হাসি হেসে বললেন, ভগবান তো একটা বোগাস ব্যাপার। আমি ওসব বিশ্বাস-টিশ্বাস করি না। আর আপনাকেও আমার ভাল লোক মনে হচ্ছে না। আপনি থার্ড গ্রেড ম্যাজিসিয়ান মাত্র। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, এখন আসুন। নমস্কার।

বেঁটে লোকটা আবার হাসতে লাগল। তারপর বলল, বিশ্বাস করো না কি হে? জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছো চোখের সামনে। কত লোক আমাকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য কত সাধ্য সাধনা করে।

আমার ইয়ার্কি করার সময় নেই। ল্যাবরেটরিতে আমি একটা জরুরী কাজ করছি। আপনারা আসতে পারেন।

বলতে বলতেই লোহিতাক্ষ অবাক হয়ে গেলেন, বেঁটে লোকটার মধ্যে কী একটা পরিবর্তন অতি দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দেখা গেল, মেঝের ওপর পাতা বাঘছালে স্বয়ং মহাদেব বসে আছেন, ছাই মাখা শরীর, মাথায় জটাজট, ধ্যান নিমীলিত চোখ, সারা গায়ে ফোঁস ফোঁস করে সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লোহিতাক্ষ তাড়াতাড়ি চোখ কচলাতে লাগলেন। ততক্ষণে শিবের বদলে ধনুর্ধর রামচন্দ্র দেখা দিয়েছেন। পরমুহূর্তেই রামচন্দ্র গায়েব হয়ে বংশীধারী কৃষ্ণকে দেখা গেল।

বেঁটে লোকটা তেমনি গা-জ্বালানো হাসি হেসে বলল, দেখলে তো! এবার প্রত্যয় হল?

লোহিতাক্ষ একটু কেমন যেন হয়ে গেলেন। ম্যাজিসিয়ানরা অনেক কৌশল জানে ঠিকই, কিন্তু এটা ম্যাজিক বলে তাঁর মনে হচ্ছিল না। একটু ধন্ধে পড়ে কিন্তু কিন্তু করতে লাগলেন।

এমন সময় অন্দর মহল থেকে তাঁর স্ত্রী একটা শাঁখ হাতে আলুথালু হয়ে ছুটে এলেন। তোমার যে মহাপাপ হচ্ছে। স্বয়ং ভগবান এসেছেন আর তুমি তাঁকে গালমন্দ করছো? ওরে বনমালী, শিগগির জল বাতাসা আর ফুল নিয়ে আয়, ধূপ দীপ জ্বালা...

বেঁটে লোকটা খুব ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে লাগল। লোহিতাক্ষর স্ত্রী ধূপ দীপ জ্বেলে জল বাতাসা আর ফুল দিয়ে ঘণ্টা নেড়ে যাবতীয় স্তবস্তুতি আউড়ে যেতে লাগলেন। লোহিতাক্ষ বেকুবের মতো চেয়ে দেখতে লাগলেন।

পুজো হয়ে গেলে লোহিতাক্ষকে একটা কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে গিন্নী বললেন, হলটা কী তোমার? প্রণাম করো।

লোহিতাক্ষ অগত্যা অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে একটা প্রণামও করে ফেললেন।

বেঁটে লোকটা খুব খুশি হয়ে বলল, লোহিতাক্ষ গাড়ল হলেও বউমাটি ভারী লক্ষ্মীমন্ত। তা তোমরা বরটর চাইবে না?

বরের কথায় কর্তা-গিন্নী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

লোকটা একটু হেসে বললেন, আরে লজ্জা কিসের? চেয়ে ফেল, চেয়ে ফেল, আমার আর বিশেষ সময় নেই।

গিন্নী ধরা গলায় বললেন, আমি আর কী চাইব বাবা? স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে থাকতে পারি...

তথাস্তু।

লোহিতাক্ষ করুণ গলায় বললেন, দ্বিতীয়বার নোবেল প্রাইজটি...

তথাস্তু।

এই বলে ভগবান উঠে দাঁড়ালেন, তারপর লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে বললেন, তবে বাপু, আমারও কিছু চাওয়ার আছে। ওই যে কী একটা ওষুধ বানাচ্ছো, ওটা আর বানিও না, একটা দুটো দুরারোগ্য রোগ আছে বলেই মানুষ এখনো ভগবানের ডাক খোঁজ করে। রোগ ভোগ লোপাট হয়ে গেলে সেটুকুর পাটও উঠে যাবে। তুমি বরং একটা দাদের মলম বা আমাশার ওষুধ বানাও, তাতেই নোবেল পেয়ে যাবে। বুঝেছো?

যে আজ্ঞে। কিন্তু...

আর কিন্তু নয়। এখনই গিয়ে সব ফর্মুলা নষ্ট করে দাওগে। শুভস্য শীঘ্রম্।

ওকে যেতে হবে না ঠাকুর, আমিই গিয়ে সব নর্দমায় ফেলে দিয়ে আসছি। বলে গিন্নীই উঠে গেলেন।

বেঁটে লোকটা একটা বাতাসা মুখে পুরে উঠে পড়ল, তারপর লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে বলল, চলি হে। অনেকটা দূর যেতে হবে। যাওয়ার আগে আসল কথাটা বলে যাই। আমি ভগবান টগবান নই। তবে গ্রহান্তরের মানুষ। পৃথিবীতে অনেকদিন ধরেই আমাদের আনাগোনা। বাঁদর থেকে তোমাদের মানুষ বানিয়েছি আমরাই। বিজ্ঞানে তালিম দিয়েছি, চাকা বানানো থেকে অ্যাটম বোমা তৈরি অবধি সব ব্যাপারেই আমাদের অদৃশ্য হাত ছিল। আর এসব যা দেখালুম তোমায় সবই বুজরুকি বটে, তবে আসল ভগবানও একজন আছেন। কিন্তু তত দূরে তোমাদের ধারণা পৌঁছোয় না বলে এই আমাদেরই তোমরা এতকাল ভগবান ভেবে পুজোআচ্চা করে এসেছো...

লোহিতাক্ষ লাফিয়ে উঠে বললেন, অ্যাঁ! তাহলে আমার দ্বিতীয় নোবেলের কী হবে?

তার আমি কী জানি, আমার বর ফলে কিনা তা আমি জানি না।

লোহিতাক্ষ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, ইয়ার্কি হচ্ছে? ঠিক আছে ফরমুলা আমার মুখস্থ। আমি ক্যানসারের ওষুধ আবার বের করে ফেলব।

লোকটা মাথা নাড়ল, না, বের করবে না। বের করলে কী হবে জানো?

কী হবে?

তুমি যে রোজ চুষিকাঠি ছাড়া ঘুমোতে পারো না সে কথা সবাইকে জানিয়ে দেবো।

কথাটা ঠিক। লোহিতাক্ষ এতবড় বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও বাচ্চা ছেলের মতো এক স্বভাব আছে তাঁর। এখনও চুষিকাঠি ছাড়া তিনি ঘুমোতে পারেন না। কিন্তু সে কথা বাড়ির লোক ছাড়া কেউ জানে না।

লোহিতাক্ষ স্তিমিত হয়ে গিয়ে বললেন, যে আজ্ঞে।

লোক দুটো বেরিয়ে গেল।

গন্ধটা খুব সন্দেহজনক

সেবার আমার দিদিমা পড়লেন ভারী বিপদে।

দাদামশাই রেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সে আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমার মা তখনও ছোট্ট ইজের-পরা খুকী। তখন এত সব শহর নগর ছিল না, লোকজনও এত দেখা যেত না। চারধারে কিছু গাছগাছালি জঙ্গল-টঙ্গল ছিল। সেই রকমই এক নির্জন জঙ্গুলে জায়গায় দাদামশাই বদলি হলেন। উত্তর বাংলার দোমোহানীতে। মালগাড়ির গার্ড ছিলেন, তাই প্রায়সময়ই তাঁকে বাড়ির বাইরে থাকতে হত। কখনো এক-নাগাড়ে তিন চার কিম্বা সাতদিন। তারপর ফিরে এসে হয়তো একদিন মাত্র বাসায় থাকতেন, ফের মালগাড়ি করে চলে যেতেন। আমার মায়েরা পাঁচ বোন আর চার ভাই। দিদিমা এই মোট নজন ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসায় থাকতেন। ছেলেমেয়েরা সবাই তখন ছোটোখাটো কাজেই দিদিমার ঝামেলার অন্ত নেই।

এমনিতে দোমোহানী জায়গাটা ভারী সুন্দর আর নির্জন স্থান। বেঁটে বেঁটে লিচু গাছে ছাওয়া, পাথরকুচি ছড়ানো রাস্তা, সবুজ মাঠ, কিছু জঙ্গল ছিল। লোকজন বেশি নয়। এক ধারে রেলের সাহেবদের পাকা কোয়ার্টার, আর অন্যধারে রেলের বাবুদের জন্য আধপাকা কোয়ার্টার, একটা ইস্কুল ছিল ক্লাস এইট পর্যন্ত। একটা রেলের ইনস্‌টিটিউট ছিল, যেখানে প্রতি বছর দু তিনবার কেদার রায় বা টিপু সুলতান নাটক হত। রেলের বাবুরা দল বেঁধে গ্রীষ্মকালে ফুটবল খেলতেন, শীতকালে ক্রিকেট। বড় সাহেবরা সে-খেলা দেখতে আসতেন। মাঝে মাঝে সবাই দল বেঁধে তিস্তা নদীর ধারে বা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে চড়ুইভাতিতেও যাওয়া হত। ছোটো আর নির্জন হলেও বেশ আমুদে জায়গা ছিল দোমোহানী।

দোমোহানীতে যাওয়ার পরই কিন্তু সেখানকার পুরোনো লোকজনেরা এসে প্রায়ই দাদামশাই আর দিদিমাকে একটা বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়ে যেতেন। কেউ কিছু ভেঙে বলতেন না। যেমন স্টোরকীপার অক্ষয় সরকার দাদামশাইকে একদিন বললেন, "এ জায়গাটা কিন্তু তেমন ভাল নয় চাটুজ্যে। লোকজন সব বাজিয়ে নেবেন। হুটহাট যাকে তাকে ঘরে দোরে ঢুকতে দেবেন না।" কিম্বা আর একদিন পাশের বাড়ির পালিত-গিন্নী এসে দিদিমাকে হেসে হেসে বলে গেলেন, "নতুন এসেছেন, বুঝবেন সব আস্তে আস্তে। চোখ কান নাক সব খোলা রাখবেন কিন্তু। ছেলে-পুলেদের সামলে রাখবেন। এখানে যারা সব আছে, তারা ভাল নয়।"

দিদিমা ভয় খেয়ে বলেন, "কাদের কথা বলছেন দিদি?"

পালিত-গিন্নী শুধু বললেন, "সে আছে, বুঝবেনখন।"

তারপর থেকে দিদিমা একটু ভয়ে ভয়েই থাকতে লাগলেন।

একদিন হল কী, পুরোনো ঝি সুখীয়ার দেশ থেকে চিঠি এল যে, তার ভাসুরপোর খুব বেমার হয়েছে, তাই তাকে যেতে হবে। একমাসের ছুটি নিয়ে সুখীয়া চলে গেল। দিদিমা নতুন ঝি খুঁজছেন, তা হঠাৎ করে পরদিন সকালেই একটা আধাবয়সী বউ এসে বলল, "ঝি রাখবেন?"

দিদিমা দোনোমোনো করে তাকে রাখলেন। সে দিব্যি কাজকর্ম করে, খায়দায়, বাচ্চাদের গল্প বলে ভোলায়। দিন দুই পর পালিত-গিন্নী একদিন সকালে এসে বললেন, "নতুন ঝি রাখলেন নাকি দিদি? কই দেখি তাকে।"

দিদিমা ডাকতে গিয়ে দেখেন কলতলায় এঁটো বাসন ফেলে রেখে ঝি কোথায় হাওয়া হয়েছে। অনেক ডাকাডাকিতেও পাওয়া গেল না। পালিত-গিন্নী মুচকি হাসি হেসে বললেন, "ওদের ওরকমই ধারা। ঝিটার নাম কী বলুন তো?"

দিদিমা বললেন, "কমলা।"

পালিত-গিন্নী মাথা নেড়ে বললেন, "চিনি, হালদার-বাড়িতেও ওকে রেখেছিল।"

দিদিমা অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো!"

পালিত-গিন্নী শুধু শ্বাস ফেলে বললেন, "সব কি খুলে বলা যায়? এখানে এই হচ্ছে ধারা। কোন্‌টা মানুষ আর কোন্‌টা মানুষ নয় তা চেনা ভারী মুশকিল। এবার দেখেশুনে একটা মানুষ ঝি রাখুন।"

ওই বলে চলে গেলেন পালিত-গিন্নী, আর দিদিমা আকাশপাতাল ভাবতে লাগলেন।

কমলা অবশ্য একটু বাদেই ফিরে এল। দিদিমা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "কোথায় গিয়েছিলে?"

সে মাথা নিচু করে বলল, "মা, লোকজন এলে আমাকে সামনে ডাকবেন না, আমি বড় লজ্জা পাই!"

কমলা থেকে গেল। কিন্তু দিদিমার মনের খট্‌কাভাবটা গেল না।

ওদিকে দাদামশাইয়েরও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। একদিন লাইনে গেছেন। নিশুতিরাতে মালগাড়ি যাচ্ছে ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দাদামশাই ব্রেকভ্যানে বসে ঝিমোচ্ছেন। হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। তা মালগাড়ি যেখানে-সেখানে দাঁড়ায়। স্টেশনের পয়েন্টসম্যান আর অ্যাসিসট্যান্ট স্টেশনমাস্টাররা অনেক সময়ে রাতবিরেতে ঘুমিয়ে পড়ে, সিগন্যাল দিতে ভুলে যায়। সে আমলে এরকম হামেশা হত। সেরকমই কিছু হয়েছে ভেবে দাদামশাই বাক্স থেকে পঞ্জিকা বের করে পড়তে লাগলেন, পঞ্জিকা পড়তে তিনি বড় ভালবাসতেন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হঠাৎ দাদামশাই শুনতে পেলেন, ব্রেকভ্যানের পিছনে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কে যেন গাড়ির ছাদে উঠছে। দাদামশাই মুখ বার করে কাউকে দেখতে পেলেন না। ফের শুনলেন, একটু দূরে কে যেন ওয়াগনের পাল্লা খোলার চেষ্টা করছে। খুব চিন্তায় পড়লেন দাদামশাই। ডাকাতরা অনেক সময় সাঁট করে সিগন্যাল বিগড়ে দিয়ে গাড়ি থামায়, মালপত্র চুরি করে। তাই তিনি সরেজমিনে দেখার জন্য গাড়ি থেকে হাতবাতিটা নিয়ে নেমে পড়লেন। লম্বা ট্রেন, তার একদম ডগায় এঞ্জিন। হাঁটতে হাঁটতে এসে দেখলেন, লাল সিগন্যাল ইতিমধ্যে সবুজ হয়ে গেছে, কিন্তু ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান কয়লার ঢিপির ওপর গামছা পেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদেরও দোষ নেই, অনেকক্ষণ নাগাড়ে ডিউটি দিচ্ছে, একটু ফাঁক পেয়েছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু ঠেলাঠেলি করে তাদের তুললেন দাদামশাই। তারপর ফের লম্বা গাড়ি পার হয়ে ব্রেকভ্যানের দিকে ফিরে আসতে লাগলেন। মাঝামাঝি এসেছেন, হঠাৎ শোনেন এঞ্জিন হুইশল দিল, গাড়িও ক্যাঁচ কোঁচ করে চলতে শুরু করল। তিনি তো অবাক। ব্রেকভ্যানে ফিরে গিয়ে তিনি সবুজ বাতি দেখালে তবে ট্রেন ছাড়বার কথা। তাই দাদামশাই হাঁ করে চেয়ে রইলেন। অবাক

হয়ে দেখেন, ব্রেকভ্যান থেকে অবিকল গার্ডের পোশাক পরা একটা লোক হাতবাতি তুলে সবুজ আলো দেখাচ্ছে ড্রাইভারকে। ব্রেকভ্যানটা যখন দাদামশাইকে পার হয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা তাঁর দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে গেল।

বহু কষ্টে দাদামশাই সেবার ফিরে এসেছিলেন।

সেবার ম্যাজিশিয়ান প্রফেসর ভট্টাচার্য চা-বাগানগুলোতে ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে দোমোহানীতে এসে পৌঁছোলেন। তিনি এলেবেলে খেলা দেখাতেন। দড়িকাটার খেলা, তাসের খেলা, আগুন খাওয়ার খেলা। তা দোমোহানীর মতো গঞ্জ জায়গায় সেই খেলা দেখতেই লোক ভেঙে পড়ল। ভট্টাচার্য স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম দৃশ্যে একটু বক্তৃতা করছিলেন, হাতে ম্যাজিকের ছোট্ট কালো একটা লাঠি। বলছিলেন ম্যাজিক মানেই হচ্ছে হাতের কৌশল, মন্ত্রতন্ত্র নয়, আপনারা যদি কৌশল ধরে ফেলেন তাহলে দয়া করে চুপ করে থাকবেন। কেউ যেন স্টেজে টর্চের আলো ফেলবেন না... ইত্যাদি। এইসব বলছেন, ম্যাজিক তখনো শুরু হয়নি, হঠাৎ দেখা গেল তাঁর হাতের লাঠিটা হঠাৎ হাত থেকে শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেল তারপর আবার আস্তে আস্তে ফিরে গেল ম্যাজিশিয়ানের হাতে। প্রথমেই আশ্চর্য খেলা দেখে সবাই প্রচণ্ড হাততালি দিল। কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্য খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এর পরের খেলা—ব্ল্যাকবোর্ডে দর্শকেরা চক দিয়ে যা খুশি লিখবেন, আর প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখ-বাঁধা অবস্থায় তা বলে দেবেন। কিন্তু আশ্চর্য, প্রফেসর ভট্টাচার্যের এই খেলাটা মোটেই সেরকম হল না। দর্শকরা কে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এই নিয়ে এ ওকে ঠেলছেন, প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখের ওপর ময়দার নেচী আর কালো কাপড় বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলছেন—চলে আসুন, সঙ্কোচের কিছু নেই, আমি বাঘ-ভাল্লুক নই...ইত্যাদি। সে সময়ে হঠাৎ দেখা গেল কেউ যাওয়ার আগেই টেবিলের ওপর রাখা চকের টুকরোটা নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠল এবং শূন্যে ভেসে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর লিখতে লাগল, প্রফেসর ভট্টাচার্য ইজ দি বেস্ট ম্যাজিশিয়ান অফ দি ওয়ার্ল্ড। এই অসাধারণ খেলা দেখে দর্শকরা ফেটে পড়ল উল্লাসে, আর ভট্টাচার্য কাঁদো-কাঁদো হয়ে চোখ-বাঁধা অবস্থায় বলতে লাগলেন, কী হয়েছে! অ্যাঁ কী হয়েছে! তারপর তিনি আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। আগুন খাওয়ার খেলাতেও আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন তিনি। কথা ছিল, মশাল জ্বেলে সেই মশালটা মুখে পুরে আগুনটা খেয়ে ফেলবেন। তাই করলেন। কিন্তু তারপরই দেখা গেল ভট্টাচার্য হাঁ-করতেই তাঁর মুখ থেকে সাপের জিভের মতো আগুনের হল্‌কা বেরিয়ে আসছে। পরে তাসের খেলা যখন দেখাচ্ছেন, তখনো দেখা গেল, কথা বলতে গেলেই আগুনের হল্‌কা বেরোয়। দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠে সাধুবাদ দিতে লাগল। কিন্তু ভট্টাচার্য খুব কাঁদো-কাঁদো মুখে চার পাঁচ সাত গ্লাস জল খেতে লাগলেন স্টেজে দাঁড়িয়েই। তবু হাঁ করলেই আগুনের হল্‌কা বেরোয়।

তখনকার মফঃস্বল শহরের নিয়ম ছিল বাইরে থেকে কেউ এরকম খেলাটেলা দেখাতে এলে তাঁকে কিংবা তাঁর দলকে বিভিন্ন বাসায় সবাই আশ্রয় দিতেন। প্রফেসর ভট্টাচার্য আমার মামাবাড়িতে উঠেছিলেন। রাতে খেতে বসে দাদামশাই তাঁকে বললেন, "আপনার খেলা গণপতির চেয়েও ভাল। অতি আশ্চর্য খেলা।"

ভট্টাচার্য বললেন, "হাঁ, অতি আশ্চর্য খেলা। আমিও এরকম আর দেখিনি!"

দাদামশাই অবাক হয়ে বলেন, "সে কী! এ তো আপনিই দেখালেন!"

ভট্টাচার্য আমতা আমতা করে বললেন, "তা বটে। আমিই তো দেখালাম! আশ্চর্য!"

তাঁকে খুব বিস্মিত মনে হচ্ছিল।

দাদামশাইয়ের বাবা সেবার বেড়াতে এলেন দোমোহানীতে। বাসায় পা দিয়েই বললেন, "তোদের ঘরদোরে একটা আঁশটে গন্ধ কেন রে?"

সবাই বলল, "আঁশটে গন্ধ! কৈ, আমরা তো পাচ্ছি না।"

দাদামশাইয়ের বাবা ধার্মিক মানুষ, খুব পণ্ডিত লোক, মাথা নেড়ে বললেন, "আলবাৎ আঁশটে গন্ধ। শুধু তোদের বাসাতেই নয়, স্টেশনে নেমেও গন্ধটা পেয়েছিলাম। পুরো এলাকাতেই যেন আঁশটে-আঁশটে গন্ধ একটা।"

কমলা দাদামশাইয়ের বাবাকে দেখেই গা ঢাকা দিয়েছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও সামনে এল না। দিদিমার তখন ভারী মুশকিল। একা হাতে সব করতে কম্মাতে হচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সব দেখে শুনে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "এসব ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

সেদিনই বিকেলে স্টেশনমাস্টার হরেন সমাদ্দারের মা এসে দিদিমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, "কমলা আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে। তা বলি বাছা, তোমার শ্বশুর ধার্মিক লোক, সে ভাল। কিন্তু উনি যদি জপতপ বেশি করেন, ঠাকুরদেবতার নাম ধরে ডাকাডাকি করেন, তাহলে কমলা এ বাড়িতে থাকে কী করে?"

দিদিমা অবাক হয়ে, "এসব কী কথা বলছেন মাসীমা? আমার শ্বশুর জপতপ করলে কমলার অসুবিধে কী?"

সমাদ্দারের মা তখন দিদিমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, "ও হরি, তুমি বুঝি জানো না? তাই বলি! তা বলি বাছা দোমোহানীর সবাই জানে যে, এ হচ্ছে ওই দলেরই রাজত্ব। ঘরে ঘরে ওরাই সব ঝি-চাকর খাটছে। বাইরে থেকে চেহারা দেখে কিছু বুঝবে না, তবে ওরা হচ্ছে সেই তারা।"

"কারা?" দিদিমা তবু অবাক।

"বুঝবে বাপু, রোসো।" বলে সমাদ্দারের মা চলে গেলেন।

তা কথাটা মিথ্যে নয়। দোমোহানীতে তখন ঝি-চাকর কিংবা কাজের লোকের

বড় অভাব। ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মশা আর বাঘের ভয়ে কোন লোক সেখানে যেতে চায় না। যাদের না গিয়ে উপায় নেই তারাই যায়। আর গিয়েই পালাই-পালাই করে। তবু ঠিক দেখা যেত, কারো বাসায় ঝি-চাকর বা কাজের লোকের অভাব হলেই ঠিক লোক জুটে যেত। স্টেশনমাস্টার সমাদ্দারের ঘরে একবার দাদামশাই বসে গল্প করছিলেন। সমাদ্দার একটা চিঠি লিখছিলেন, সেটা শেষ করেই ডাকলেন, "ওরে, কে আছিস?" বলামাত্র একটা ছোকরামতো লোক এসে হাজির। সমাদ্দার তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন "চিঠিটা ডাকে দিয়ে আয়।" দাদামশাই তখন জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটাকে নতুন রেখেছেন নাকি?" সমাদ্দার মাথা নেড়ে বলেন, "না না, ফাইফরমাশ খেটে দিয়ে যায় আর কি। খুব ভাল ওরা, ডাকলেই আসে। লোক-টোক নয়, ওরা ওরাই।"

তো তাই। মামাদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন ধর্মদাস নামে একজন বেঁটে আর ফর্সা ভদ্রলোক। তিনি থিয়েটারে মেয়ে সেজে এমন মিহি গলায় মেয়েলী পার্ট করতেন যে, বোঝাই যেত না তিনি মেয়ে না ছেলে। সেবার সিরাজদৌল্লা নাটকে তিনি লুৎফা। গিরীশ ঘোষের নাটক। কিন্তু নাটকের দিনই তাঁর ম্যালেরিয়া চাগিয়ে উঠল। লেপচাপা হয়ে কোঁ-কোঁ করছেন। নাটক প্রায় শিকেয় ওঠে। কিন্তু ঠিক দেখা গেল, নাটকের সময়ে লুৎফার অভাব হয়নি, একেবারে ধর্মদাস মাস্টারমশাই-ই যেন গোঁফ কামিয়ে আগাগোড়া নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন। কেউ কিছু টের পেল না। কিন্তু ভিতরকার কয়েকজন ঠিকই জানত যে, সেদিন ধর্মদাস মাস্টারমশাই মোটেই স্টেজে নামেননি। নাটকের শেষে সমাদ্দার দাদামশাইয়ের সঙ্গে ফিরে আসছিলেন, বললেন, "দেখলেন, কেমন কার্যোদ্ধার হয়ে গেল। একটু খোনাসুরও কেউ টের পায়নি।"

দাদামশাই তখন চেপে ধরলেন সমাদ্দারকে, "মশাই, রহস্যটা কী একটু খুলে বলবেন?"

সমাদ্দার হেসে শতখান হয়ে বললেন, "সবই তো বোঝেন মশাই। একটা নীতিকথা বলে রাখি, সদ্ভাব রাখলে সকলের কাছ থেকেই কাজ পাওয়া যায়। কথাটা খেয়াল রাখবেন।"

মামাদের মধ্যে যারা একটু বড়, তারা বাইরে খেলে বেড়াত। মা আর বড়মাসী তখন কিছু বড় হয়েছে। অন্য মামা-মাসীরা নাবালক নাবালিকা। মার বড় লুডো খেলার নেশা ছিল। তা মা আর মাসী রোজ দুপুরে লুডো পেড়ে বসত, তারপর ডাক দিত, "আয় রে।" অমনি টুক করে কোথা থেকে মায়ের বয়সীই দুটো মেয়ে হাসিমুখে লুডো খেলতে বসে যেত। মামাদের মধ্যে যারা বড় হয়েছে, সেই বড় আর মেজো মামা যেত বল খেলতে। দুটো পাট্টিতে প্রায়ই ছেলে কম পড়ত। ছোটো জায়গা তো, বেশি লোকজন ছিল না। কিন্তু কম পড়লেই মামারা ডাক

দিত, "কে খেলবি আয়।" অমনি চার-পাঁচজন এসে হাজির হত, মামাদের বয়সীই সব ছেলে। খুব খেলা জমিয়ে দিত।

এই খেলা নিয়েই আর একটা কাণ্ড হল একবার। দোমোহানীর ফুটবল টিমের সঙ্গে এক চা-বাগানের টিমের ম্যাচ। চা-বাগান থেকে সাঁওতাল আর আদিবাসী দুর্দান্ত চেহারার খেলোয়াড় সব এসেছে। দোমোহানীর বাঙালী টিম জুত করতে পারছে না, হঠাৎ দোমোহানীর টিম খুব ভাল খেলা শুরু করল, দুটো গোল শোধ দিয়ে আরো একখানা দিয়েছে। এমন সময় চা-বাগান টিমের ক্যাপ্টেন খেলা থামিয়ে রেফারীকে বলল, "ওরা বারোজন খেলছে।" রেফারী গুনে দেখলেন, না, এগারোজনই। ফের খেলা শুরু হতে একটু পরে রেফারীই খেলা থামিয়ে দোমোহানীর ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললেন, "তোমাদের টিমে চার পাঁচজন একস্ট্রা লোক খেলছে।"

দুর্দান্ত সাহেব-রেফারী, সবাই ভয় পায়। দোমোহানীর ক্যাপ্টেন বুক ফুলিয়ে বলল, "গুনে দেখুন।" রেফারী গুনে দেখে আহাম্মক। এগারোজনই।

দোমোহানীর টিম আরো তিনটে গোল দিয়ে দিয়েছে। রেফারী আবার খেলা থামিয়ে ভীষণ রেগে চেঁচিয়ে বললেন, "দেয়ার আর অ্যাট লীস্ট্ টেন একস্ট্রা মেন ইন দিস টিম।"

দর্শকদেরও তাই মনে হয়েছে। গুনে দেখা যায় 'এগারোজন', কিন্তু খেলা শুরু হতেই যেন ঘাসের বুকে লুকিয়ে থাকা, কিংবা বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে থাকা সব খেলোয়াড় পিলপিল করে নেমে পড়ে মাঠের মধ্যে। রেফারী দোমোহানীর টিমকে লাইন আপ করিয়ে সকলের মুখ ভাল করে দেখে বললেন, "শেষ তিনটে গোল যারা করেছে তারা কোথায়? তাদের তো দেখছি না। একটা কালো ঢ্যাঙা ছেলে, একটা বেঁটে আর ফর্সা, আর একটা ষাঁড়ের মতো, তারা কই?"

দোমোহানীর ক্যাপ্টেন মিন মিন করে যে সাফাই গাইল, তাতে রেফারী আরো রেগে টং। চা-বাগানের টিমও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপসে পড়েছে। কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

খেলা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল। দাদামশাইয়ের বাবা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে খেলার হালচাল দেখে বললেন, "আবার সেই গন্ধ। এখানে একটা রহস্য আছে, বুঝলে সমাদ্দার?" স্টেশনমাস্টার সমাদ্দার পাশেই ছিলেন, বললেন, "ব্যাটারা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।"

"কে? কাদের কথা বলছো?"

সমাদ্দার এড়িয়ে গেলেন। দাদামশাইয়ের বাবা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

দাদামশাইয়ের বাবা সবই লক্ষ্য করতেন, আর বলতেন, "এসব ভাল কথা

নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। ও বৌমা, এসব কী দেখছি তোমাদের এখানে? হুট্ বলতেই সব মানুষজন এসে পড়ে কোত্থেকে, আবার হুশ্ করে মিলিয়ে যায়। কাল মাঝরাতে উঠে একটু তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল, উঠে বসে কেবলমাত্র আপনমনে বলেছি একটু তামাক খাই। অমনি একটা কে যেন বলে উঠল, এই যে বাবামশাই, তামাক সেজে দিচ্ছি। অবাক হয়ে দেখি, সত্যিই একটা লোক কল্কে ধরিয়ে এনে হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে গেল। এরা সব কারা?"

দিদিমা আর কী উত্তর দেবেন? চুপ করে থাকেন। দাদামশাইও বেশি উচ্চবাচ্য করেন না। বোঝেন সবই। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা কেবলই চারধারে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়ান, আর বলেন, "এ ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

মা প্রায়ই তাঁর দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। রাস্তাঘাটে লোকজন কারো সঙ্গে দেখা হলে তারা সব প্রণাম বা নমস্কার করে সম্মান দেখাত দাদামশাইয়ের বাবাকে, কুশল প্রশ্ন করত। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা বলতেন, "রোসো বাপু, আগে তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, গায়ের গন্ধ শুঁকি তারপর কথাবার্তা।" এই বলে তিনি যাদের সঙ্গে দেখা হত তাদের গা টিপে দেখতেন, শুঁকতেন, নিশ্চিন্ত হলে কথাবার্তা বলতেন। তা তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। সে সময়ে দোমোহানীতে রাস্তায় ঘাটে বা হাটেবাজারে যে সব মানুষ দেখা যেত তাদের বারো আনাই নাকি সত্যিকারের মানুষ নয়। তা নিয়ে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাত না। সকলেরই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাস জিনিসটাই ভারী অদ্ভুত। যেমন বড়মামার কথা বলি। দোমোহানীতে আসবার অনেক আগে থেকেই তাঁর ভারী ভূতের ভয় ছিল। তাঁরও দোষ দেওয়া যায় না। ঐ বয়সে ভূতের ভয় কারই বা না থাকে। তাঁর কিছু বেশি ছিল। সন্ধের পর ঘরের বার হতে হলেই তাঁর সঙ্গে কাউকে যেতে হত। দোমোহানীতে আসার অনেক পরেও সে অভ্যাস যায়নি। একদিন সন্ধেবেলায় বসে ধর্মদাস মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছেন একা, বাড়ির সবাই পাড়া-বেড়াতে গেছে। ঠিক সেই সময়ে তাঁর বাথরুমে যাওয়ার দরকার হল। মাস্টারমশাইকে তো আর বলতে পারেন না—আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়ান। তাই বাধ্য হয়ে ভিতর বাড়িতে এসে অন্ধকারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "এই শুনছিস?"

অমনি একটা সমবয়সী ছেলে এসে দাঁড়াল, "কী বলছো?"

"আমি একটু বাথরুমে যাবো, আমার সঙ্গে একটু দাঁড়াবি চল তো।"

সেই শুনে ছেলেটা তো হেসে কুটিপাটি, বলল, "দাঁড়াবো কেন? তোমার কিসের ভয়?"

বড়মামা ধমক দিয়ে বলেন, "ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস না। দাঁড়াতে বলছি দাঁড়াবি।"

ছেলেটা অবশ্য দাঁড়াল। বড়মামা বাথরুমে কাজ সেরে এলে ছেলেটা বলল,

"কিসের ভাল বললে না?"

বড়মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভূতের।"

ছেলেটা হাসতে হাসতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল। বড়মামা রেগে গিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, "শুধু ফাজিল হয়েছো তোমরা।"

তা এইরকম সব হত দোমোহানীতে। কেউ গা করত না। কেবল দাদামশাইয়ের বাবা বাতাস শুঁকতেন, লোকের গা শুঁকতেন। একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে তাঁর হাতে মাছের ছোট্ট খালুই, তাতে সিঙ্গি মাছ নিয়ে আসছিলেন, তো একটা মাছ মাঝপথে খালুই বেয়ে উঠে রাস্তায় পড়ে পালাচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সেই মাছ ধরতে হিমসিম খাচ্ছেন, ধরলেই কাঁটা দেয় যদি। এমন সময়ে একটা লোক খুব সহৃদয় ভাবে এসে মাছটাকে ধরে খালুইতে ভরে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। দাদামশাইয়ের বাবা তাকে থামিয়ে গা শুঁকেই বললেন, "এ তো ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুবই সন্দেহজনক! তুমি কে হে! অ্যাঁ! কারা তোমরা?"

এই বলে দাদামশাইয়ের বাবা তার পথ আটকে দাঁড়ালেন। লোকটা কিন্তু ঘাবড়াল না। হঠাৎ একটু ঝুঁকে দাদামশাইয়ের বাবার গা শুঁকে সেও বলল, "এ তো ভাল কথা নয়! গন্ধটা বেশ সন্দেহজনক। আপনি কে বলুন তো! অ্যাঁ! কে?"

এই বলে লোকটা হাসতে হাসতে বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাদামশাইয়ের বাবা আর গন্ধের কথা বলতেন না। একটু গম্ভীর হয়ে থাকতেন ঠিকই, ভূতের অপমানটা তাঁর প্রেস্টিজে খুব লেগেছিল। একটা ভূত তাঁর গা শুঁকে ঐ কথা বলে গেছে, ভাবা যায়?

ঘুড়ি ও দৈববাণী

অঘোরবাবু নিরীহ মানুষ। বড়ই রোগা-ভোগা। তাঁর হার্ট খারাপ, মাজায় সায়াটিকার ব্যথা, পেটে এগারো রকমের অসুখ। অফিসে তাঁর উন্নতি হয় না। কেউ পাত্তা দেয় না তাঁকে।

অঘোরবাবু ঘুড়ি ওড়াতে খুবই ভালবাসেন। তাঁর শখ-শৌখিনতা বলতে ওই একটাই। ঘুড়ি তিনি নিজেই তৈরি করেন। মস্ত মস্ত ঘুড়ি। মোটা সুতো আর মস্ত লাটাই দিয়ে অনেক ওপরে ঘুড়ি ভাসিয়ে দেন তিনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাটাই ধরে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বসে থাকেন।

সেদিন একটা কাণ্ড হলো। বিকেল বেলা ঘণ্টা দুয়েক ঘুড়ি ওড়ানোর পর অন্ধকার হয়ে আসায় লাটাই গুটিয়ে যখন ঘুড়িটা ছাদ থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছেন তখন মনে হলো ঘুড়ির গায়ে একটা কিছু যেন লেখা আছে। ঘরে এসে আলো জ্বেলে দেখলেন, সাদা ঘুড়িতে পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে বাংলায় লেখা, আগামী সতেরো তারিখে আপনার মৃত্যু হবে, যদি না একখানা আস্ত গায়ে-মাখা সাবান খেয়ে ফেলেন।

অঘোরবাবু ঘোরতর অবাক। প্রায় আধ কিলোমিটার ওপরে উড়ন্ত ঘুড়ির গায়ে এই বিদঘুটে কথাটা লিখল কে? ভৌতিক কাণ্ড নাকি? মহা ভাবিত হয়ে পড়লেন তিনি। পাশের বাড়িতেই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পরঞ্জয় প্রামাণিক থাকেন। অঘোরবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁকে ডেকে ঘুড়ির গায়ে লেখাটা দেখিয়ে বললেন, এটা কি করে সম্ভব হলো?

পরঞ্জয় গম্ভীর হয়ে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে সাবানটা খেও না, সাবান খেলে পেট খারাপ হয়। মনে হচ্ছে কেউ রসিকতা করেছে।

অঘোরবাবু বললেন, কিন্তু আকাশের অত ওপরে কোনও রসিকের তো থাকার কথা নয়। রসিকদের কি আজকাল ডানা গজাচ্ছে?

পরঞ্জয় এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারলেন না।

অঘোরবাবু হিসেব করে দেখলেন সতেরো তারিখের আর মোটে সাত দিন বাকি। অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে তিনি বাড়ির কাউকে কিছু না বলে বাথরুমে গিয়ে একখানা গায়ে-মাখা সাবান অত্যন্ত কষ্ট করে খেয়ে ফেললেন। সাবান যে খেতে এত বিচ্ছিরি তা তাঁর জানা ছিল না।

পরঞ্জয়ের কথা অক্ষরে ফলে গেল। পরদিন অঘোরবাবু পেটের গোলমালে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন। দুদিন লাগল বিছানা ছেড়ে উঠতে। বিকেলে তিনি আবার ঘুড়ি ওড়াতে ছাদে উঠলেন। এবং যথারীতি লাটাই গোটানোর পর দেখলেন ঘুড়ির গায়ে লেখা রয়েছে, আগামী সতেরো তারিখে আপনি মারা যাবেন, যদি না কৃষ্ণ কুণ্ডুর কান মলে দেন।

কৃষ্ণ কুন্ডুর কান মলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ, সে হলো এ পাড়ার কুখ্যাত গুন্ডা। তার ভয়ে সবাই থরহরি কম্পমান। গায়ে যেমন জোর তেমনি বদমেজাজ। অঘোরবাবু ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু এই অনৈসর্গিক আদেশ অমান্য করতেও তাঁর সাহস হচ্ছে না। সতেরো তারিখের আর দেরিও নেই। আজ চোদ্দ তারিখ।

সন্ধের পর তিনি সোজা গিয়ে কৃষ্ণ কুণ্ডুর বাড়িতে হাজির হলেন। কৃষ্ণ কুণ্ডু তখন একটা মস্ত বড় ছোরা ধার দিচ্ছিল। তাঁকে দেখে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে বলল, কী চাই?

অঘোরবাবু কাঁপতে কাঁপতে সামনে গিয়ে আচমকা ডান হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণ কুণ্ডুর বাঁ কানটা মলে দিয়েই দৌড় লাগালেন।

কিন্তু দৌড়ে পারবেন কেন? কৃষ্ণ কুণ্ডু ছুটে এসে ক্যাঁক করে তাঁর ঘাড়টা ধরে নেংটি ইঁদুরের মতো শূন্যে তুলে উঠোনে এনে ফেলল। তারপর মুগুরের মতো দুখানা হাতে গদাম গদাম করে ঘুঁষি মারতে লাগল। তিনি ঘুঁষি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ায় পিঠের ওপর একেবারে তবলা লহরার মতো কিল-চড়-ঘুঁষি পড়তে লাগল। জীবনে এরকম সাঙ্ঘাতিক মার কখনও খাননি অঘোরবাবু। যখন ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর মনে হচ্ছিল, শরীরের একটি হাড়ও আস্ত নেই। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। চোখে অন্ধকার দেখছেন। কানেও কিছু শুনতে পাচ্ছেন না।

ফের দুদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হলো। তারপর অঘোরবাবু ফের একদিন বিকেলে ঘুড়ি ওড়ালেন। আজও ঘুড়ি নামিয়ে দেখলেন তাতে লেখা, সতেরো তারিখে মৃত্যু অবধারিত, যদি না বড় সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালতে পারেন। বড় সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালার আদেশের চেয়ে মৃত্যুদণ্ডই বোধহয় ভাল। কারণ, অঘোরবাবুর অফিসের বড় সাহেব খোদ আমেরিকার রাঙামুখো সাহেব। যেমন রাশভারি, তেমনি শৃঙ্খলাপরায়ণ। পান থেকে চুন খসতে দেন না। তাছাড়া বড় সাহেবের নাগাল পাওয়া কঠিন। আলাদা ঘরে বসেন, বাইরে আর্দালিরা পাহারা থাকে।

কিন্তু ঘুড়ির আদেশ অমান্য করতে সাহস হলো না তাঁর। দোকান থেকে দৈ আনিয়ে গেলাসভর্তি ঘোল তৈরি করে একটা ফ্লাস্কে ভরে অফিসে গেলেন অঘোরবাবু। খুবই অন্যমনস্ক, বুকটা দুরদুর করছে। বড়বাবুকে গিয়ে একবার

বললেন, বড় সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই, ব্যবস্থা করে দেবেন?

বড়বাবু অবাক হয়ে বললেন, তুমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিচ্ছো কেন? বড় সাহেব কি হেঁজিপেঁজির সঙ্গে দেখা করেন? আর করেই লাভ কী? সাহেবের আমেরিকান ইংরিজি কি তুমি বুঝবে? বুকনি শুনলে ভড়কে যাবে যে!

বেজার মুখ ফিরে এলেন বটে অঘোরবাবু, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। টিফিনের সময় ফাঁক বুঝে বেরিয়ে করিডোর ঘুরে সোজা বড় সাহেবের খাস কামরার সামনে হাজির হলেন। দেখলেন বড় সাহেবের ঘর থেকে কয়েকটা লালমুখো সাহেব

বেরিয়ে আসছে। আর্দালি দুটো তাদের নিয়েই ব্যস্ত।

অঘোরবাবু সুট করে ঘরে ঢুকে পড়লেন। বিশাল চেহারার বড় সাহেব মন দিয়ে একটা কাজ করছিলেন। মাথায় মস্ত গোলাপী রঙের টাক। অঘোরবাবুকে দেখে অবাক হয়ে বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট বাবু?

অঘোরবাবু ফ্লাস্কটা খুলে সাহেবের মাথায় হড়হড় করে ঘোলাটা ঢেলে দিলেন। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে একেবারে সোজা রাস্তায় নেমে একটা বাসে উঠে পড়লেন।

চাকরি তো যাবেই, পুলিশেও ধরতে পারে। তা হোক, তবু অনৈসর্গিক ওই আদেশ লঙ্ঘন করেনই বা কি করে?

সতেরো তারিখ এগিয়ে আসছে। আগামীকালই সতেরো তারিখ। বিকেলে

অঘোরবাবু ফের ঘুড়ি ওড়ালেন। অনেকক্ষণ ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে নানা কথা ভাবছিলেন। বুকটাও দুরদুর করছে। তারপর ধীরে ধীরে লাটাই গোটাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ঘুড়িটা নেমে এল। ঘুড়িটা হাতে নিয়ে দেখলেন, তাতে লেখা, আগামী সতেরো তারিখ মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না, যদি না এক্ষুণি তিনতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েন।

অঘোরবাবুর হাত-পা কাঁপতে লাগল ভয়ে। তিনতলা থেকে লাফ দিলে যে মৃত্যুর জন্য আর সতেরো তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। কিন্তু করেনই বা কী? ঘুড়ি মারফৎ দৈববাণীই হচ্ছে বলে তাঁর স্থির প্রত্যয় হয়েছে, দৈববাণীর আদেশ না মানলে যদি ভগবান চটে যান?

অঘোরবাবু চোখ বুজে ভগবানকে স্মরণ করলেন। শেষবারের মতো চারদিকটা জল-ভরা চোখে একবার দেখে নিলেন। এইসব কাজে বেশি দেরি করতে নেই। দেরি করলেই মন দুর্বল হয়ে পড়ে, দ্বিধা আসে। অঘোরবাবু ধুতির কোঁচা এঁটে ছাদের রেলিঙের ওপর উঠে দুর্গা বলে নিচে লাফিয়ে পড়লেন।

পড়ে মাজার ব্যথায়, ঘাড়ের ঝনঝনিতে, কনুইয়ে খটাং-এ, মাথার কটাং-এ চোখে সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে মূর্ছা গেলেন। পাড়ার লোক, বাড়ির লোক সব দৌড়ে এল, কান্নাকাটি পড়ে গেল। ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতলে। প্রায় পনেরো দিন সেখানে পড়ে থাকতে হলো। তারপর বাড়িতে এসে ফের কিছুদিন চিকিৎসা চলল তাঁর। পারিবারিক ডাক্তার অভয়বাবু তাঁর বন্ধুও বটে। অভয়বাবু কয়েকদিন ধরে নানারকম পরীক্ষা করার পর একদিন বললেন, বুঝলে অঘোর, একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে।

অঘোরবাবু ভয় খেয়ে বললেন, কী ঘটেছে ভাই?

তোমার হার্ট একদম ভাল হয়ে গেছে।

সে কী! কী করে হলো?

ওই যে কেষ্ট গুন্ডার কাছে মার খেয়েছিলে, মনে হচ্ছে সেই শক থেরাপীতেই হার্টটা ঠিকঠাক চলতে শুরু করেছে। হার্টের একটা ভালভ কাজই করছিল না। এখন করছে। আরও একটা ব্যাপার!

আবার কী?

তোমার পেটে এগারো রকমের অসুখ ছিল। এখন একটাও নেই।

বলো কি হে!

হ্যাঁ। ওই যে সাবান খেয়েছিলে, ওর ঠেলাতেই পেটের সব রোগ-জীবাণু বেরিয়ে গেছে। এখন লোহা খেলেও তোমার হজম হবে। আরও একটা ব্যাপার।

অঘোরবাবু অবাকের পর আরও অবাক হয়ে বললেন, আরও?

হ্যাঁ। তোমার সায়াটিকা সেরে গেছে।

অ্যাঁ।

হ্যাঁ, ওই যে ছাদ থেকে লাফ দিয়েছিলে, তারই চোটে সায়াটিকা উধাও হয়ে গেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার।

হ্যাঁ, খুবই আশ্চর্য ব্যাপার।

কিন্তু সব হলেও চাকরিটা তো আর থাকছে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অঘোরবাবুর খুব দুঃখ হয়। দিব্যি বাঁধা চাকরি ছিল। বড় সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালার পর আর কোনও আশা নেই।

অঘোরবাবু যখন একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসেছেন, একটু পায়চারি-টায়চারি করতে পারছেন তখন একদিন সকালবেলা তাঁর বাড়ির সামনে মস্ত একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে এক লালমুখো বিশাল সাহেব নেমে এল। অঘোরবাবু বেজায় ঘাবড়ে গেলেন।

কিন্তু অল্পবয়সী সাহেবটা এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে এমন আনন্দ করতে লাগল যে সেই ভীম আলিঙ্গনে অঘোরবাবুর প্রাণ যায় আর কি।

তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে সাহেব বলল, তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব তা বুঝতে পারছি না। যাকগে, আপাতত তোমাকে তিন গুণ প্রমোশন দিয়ে আমার অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার করে নিচ্ছি। তোমার দু হাজার টাকা বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অফিসে যাতায়াতের জন্য গাড়িও দেওয়া হবে।

অঘোরবাবু স্বপ্ন দেখছেন কিনা বুঝতে পারছিলেন না। নিজের গায়ে একটা চিমটি কেটে দেখলেন, জেগেই আছেন। তাহলে এসব কী হচ্ছে?

সাহেব নিজে থেকেই বলল, তোমার মতো গুণী মানুষ দেখিনি। টাক নিয়ে আমার খুব দুঃখ ছিল। টাকের জন্য কত ওষুধ খেয়েছি, কত চিকিৎসা করেছি, কিছুতেই কিছু হয়নি। কিন্তু তুমি সেদিন আমার মাথায় কী একটা ওষুধ ঢেলে দিয়ে এলে, এই দেখ এখন আমার মাথাভর্তি সোনালী চুল।

তাই বটে। ইনি তো বড় সাহেবই বটে। মাথাভর্তি চুল হওয়ায় এতক্ষণ চিনতে পারেননি অঘোরবাবু। গদগদ হয়ে বললেন, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।

সংবর্ধনা

এই যে বিশুবাবু, নমস্কার। শুনলাম আপনার মামাশ্বশুর নাকি লটারি পেয়েছেন!

ঠিকই শুনেছেন।

তা কত টাকা পেলেন তিনি?

ভালই পেয়ে থাকবেন। পাঁচ দশ লাখ পেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

তাহলে বিশুবাবু এ তো বেশ গৌরবের কথাই, কী বলেন? লটারি ক'জন পায় বলুন! লটারি পাওয়া মানে তো দশজনের একজন হয়ে ওঠা। এই গৌরবজনক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে কি আপনার কিছু করা উচিত নয়? মামাশ্বশুর তো আর পর নয়। আমাদের সকলেরই তো মামাশ্বশুর আছে, কেউ তো এমন বিরল কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। আমার মামাশ্বশুর তো হাড়হাভাতে। আপনার কি মনে হয় না যে লটারি জেতার জন্য ওঁকে প্রথমে একটা গণ ও পরে একটা নাগরিক ও তারও পরে একটা পুর সংবর্ধনা দেওয়া উচিত!

তা তো বটেই।

এ বিষয়ে একটা কমিটিও কি অবিলম্বে গঠন করা উচিত নয়। লটারিতে জয় তো চাট্টিখানি কথা নয়। লাখ লাখ লোক প্রতিদিন লটারি খেলছে, কিন্তু প্রাইজ পায় ক'জন বলুন।

অতি ঠিক কথা।

এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা প্রায় ত্রিশ বছরের। ত্রিশ বছরে মোট সাতশ একত্রিশজনকে নানারকম কৃতিত্বের জন্য সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা আমিই করেছি। ব্যায়ামবীর বলরাম শীল, নৃত্যশিল্পী কল্লোলিনী কয়াল, জাদুকর পি পাল, সাঁতারু বিপ্লব বসু'র মতো বিখ্যাত লোকরা তো আছেই। তাছাড়া ধরুন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরল কৃতিত্বের জন্য আমরা পাঁচু চোর, পরেশ পকেটমার, গুল মারার জন্য গয়েশ গায়েন—এদেরও বাদ দিইনি। সংবর্ধনায় আমার খুব হাতযশ।

শুনে বড্ড খুশি হলাম। আপনি করিৎকর্মা লোক।

আজ্ঞে সবাই তাই বলে, তবে এটাকে আমি দেশ বা দশের সেবা বলেই মনে করি। অনেকেই বলে বটে, নিতাইবাবুর মতো এরকম আত্মত্যাগ, এরকম কর্মোদ্যোগী, এত বড় সংগঠক বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু আমি ভাবি, এটা তো আমার পবিত্র কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। কী বলেন?

না না, তা বললে হবে কেন? আপনি বিনয়ী মানুষ বলেই কৃতিত্ব স্বীকার করতে চাইছেন না। কিন্তু আত্মত্যাগ কটা লোক আর করছে বলুন।

সে অবশ্য ঠিক কথা। সেদিন নবীনবাবু তো বলেই ফেললেন, নিতাইবাবু, আপনি দেশের যুবসমাজের কাছে এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

নবীনবাবু ঠিকই বলেছেন।

আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে এভাবে জনগণের সেবা যেন আজীবন করে যেতে পারি।

সে তো বটেই। সেবাটা চালিয়ে যাওয়াই উচিত।

তবে কি না সেবা করতে করতেই জীবনটা কেটে যাচ্ছে, নিজের দিকে আর তাকাতে পারলুম কই বলুন।

দেশসেবকরা, জনগণের সেবার্তরা নিজের দিকে তো তাকায় না। তাকাতে নেইও।

এই আপনার মামাশ্বশুরের কথাই ধরুন, আমরা পাঁচজন তাঁর কৃতিত্বের কথা সর্বসমক্ষে তুলে না ধরলে একটা জাতীয় কর্তব্যকেই কি অবহেলা করা হবে না?

আগামী রোববারই আমরা সংবর্ধনা কমিটি তৈরি করছি। লোকের অনুরোধে আমি সভাপতি হতে অনিচ্ছে সত্ত্বেও রাজি হয়েছি।

আপনার মতো কৃতী লোক থাকতে অন্য কাউকে সভাপতি করা হবেই বা কেন বলুন। সেটা যে গুরুতর অন্যায় হবে।

হেঁঃ হেঁঃ, সেইজন্যই রাজি হতে হলো। সংবর্ধনা তো চাট্টিখানি কথা নয়। হল ভাড়া করা, ফুলের তোড়া, মালা ইত্যাদির যোগাড়, তারপর ধরুন উদ্বোধনী সঙ্গীতের আর্টিস্ট এসব তো লাগবেই। সংবর্ধনার পর জনগণের মনোরঞ্জনেরও তো একটু ব্যবস্থা রাখতে হবে, না কি? তার জন্য কিশোরকণ্ঠী, মুকেশকণ্ঠী, হেমন্তকণ্ঠী কয়েকজন আর্টিস্টকে আনা, একটা মূকাভিনয়, একটু ম্যাজিক ট্যাজিক, তারপরে একখানা নাটক, হরবোলা, অর্কেস্ট্রা কোন্‌টা না হলে চলে বলুন। মাইকের ভাড়া, জলযোগের ব্যবস্থা এসব তো না করলেই নয়।

যে আজ্ঞে। এসব তো সংবর্ধনার চিরকালীন অঙ্গ, বাদ দিলে অঙ্গহানি হবে।

খরচাপাতিও আছে, তা ধরুন গিয়ে হাজার বিশেক টাকা হলে ম্যানেজ করে নেওয়া যায়।

বিশ হাজার তো আজকালকার বাজারে কিছুই নয়! আপনি ভাল সংগঠক বলেই হয়তো ম্যানেজ করতে পারবেন।

যে আজ্ঞে, তবে ওটা জনগণের চাঁদা থেকেই তুলে নিতে হবে। আর বাকি হাজার বিশেক টাকা যদি আপনার মামাশ্বশুরকে বলে একটা ডোনেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে আর ভাবনা থাকে না। লটারিটা তো হেলায় জয় করেছেন, ওই সামান্য টাকা ওঁর গায়েই লাগবে না।

সে আর বেশি কথা কী? যিনি লটারি মেরেছেন তার তো আর টাকার অভাব নেই। ও নিয়ে আপনি ভাববেন না।

নিশ্চিন্ত হতে পারি তো?

নিশ্চয়ই। তবে মামাশ্বশুরকে বলে টাকা আদায় করতে একটু সময় লাগবে।

কেন বলুন তো, উনি কি খুব ব্যস্ত?

তা ব্যস্তই বোধহয়। লটারি পেলে সকলেই তো খুব ভি আই পি হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। আপনি বরং আমাকে একবার তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।

সেটাও শক্ত নয়, তবে দেরি হবে।

আচ্ছা, এই দেরিটার কথা বারবার বলছেন কেন বলুন তো! নিজের মামাশ্বশুরের সঙ্গে কি আপনার সৎভাব নেই?

আজ্ঞে সৎভাব থাকারই তো কথা ছিল।

তবে দেরি হবে কেন?

লজ্জার কথা হলো তাঁকে খুঁজে বার করতে একটু সময় লাগবে।

বলেন কি? তিনি কি লটারি পেয়ে সাধু বা পাগল বা বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন? লটারি পাওয়ার শক অবশ্য অনেকে ঠিক সামলাতে পারে না।

সেরকমও হতে পারে। আমার কাছে সঠিক তথ্য নেই। তবে সময় দিলে আমি তাকে ঠিকই খুঁজে বের করব?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাক্ষাৎ মামাশ্বশুর বলে কথা। তার ওপর শাঁসালো মানুষ। এরকম মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে আমাদের কাজকারবারই চলবে কিসে?

ঠিক কথাই, তবে আপনার অনুরোধ আমার মনে থাকবে। আমি তাকে খুঁজে বের করবই।

কত দেরি হবে বলতে পারেন?

তা দু'চার বছর ধরে রাখুন।

অ্যাঁ! সর্বনাশ! দুচার বছর কী বলছেন মশাই? তাহলে সংবর্ধনার কী হবে? পাড়ার ক্লাবের ছোকরারা যে আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। বলি পুলিশে খবর দিয়েছেন তো!

আজ্ঞে না, পুলিশকে এখনও জানানো হয়নি অবিশ্যি। তবে ঘটককে বলা হয়েছে বলে শুনলাম।

ঘটক! এর মধ্যে ঘটক আসছে কেন? লটারি পেয়ে আপনার মামাশ্বশুর কি আরও বিয়ে করতে চান নাকি?

তা চাইতেও পারেন। আমার ঠিক জানা নেই, তবে ঘটক ছাড়া তাঁকে খুঁজে বার করা মুশকিল।

কেন বলুন তো! ঘটকের ভূমিকাটা কী?

উনিই খুঁজে আনবেন কি না, অবিশ্যি মামাশ্বশুরের আগে তার ভাগ্নীকেই খুঁজে পাওয়া দরকার।

ভাগ্নী! আচ্ছা মশাই, ভাগ্নীর কথা উঠছে কেন?

যার ভাগ্নী নেই তার যে মামাশ্বশুর হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতাই নেই, এটা তো মানবেন!

সে তো ঠিকই, কিন্তু আপনার মামাশ্বশুরের অসুবিধাটা কী?

সেটা তাকেই জিজ্ঞেস করা যেতে পারত যদি তিনি বিধিমতো আমার মামাশ্বশুর হতেন।

বাধাটা কোথায়?

মামাশ্বশুর হননি বলেই বাধা, যার মামাশ্বশুর থাকে না সে যে অতি হতভাগ্য তা আজ আপনার কথা শুনেই বুঝলাম। ব্যাপারটা হলো আপনার কথামতো লটারি জেতা মামাশ্বশুর খুঁজতে হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

সবই যে গুলিয়ে দিচ্ছেন মশাই।

ব্যাপারটা গোলমেলে ঠিকই, কথাটা হলো মামাশ্বশুর বা নিদেন তার ভাগ্নীটিকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে সমস্যাটা জটিলই থেকে যাবে। প্রথম তার ভাগ্নীকে খুঁজে বের করা, পাত্রী দেখা, বিয়ের যোগাড়যন্তর করা, বিয়ে হওয়া—এই এতসব কাণ্ডের পর তবে না আপনি আমার মামাশ্বশুরের নাগাল পাবেন?

তার মানে কি আপনার মামাশ্বশুরই নেই বিশুবাবু?

আজ্ঞে না। মামাশ্বশুর নেই, তার ভাগ্নীর সঙ্গে আমার বিয়েটাই যে হয়নি এখনও, আর আমি বিশুবাবুও নই।

তাহলে তো মুশকিলে ফেললেন মশাই। সংবর্ধনটা কি ভেস্তে যাবে তাহলে? সংবর্ধনার জন্য যে পাড়ার ছেলেগুলো ক্ষেপে উঠেছে।

আহা, তাতে আটকাচ্ছে কেন? আপনার মতো একজন কৃতী মানুষকে তো জনগণের সংবর্ধনা দেওয়া উচিত।

তা অবশ্য খুব একটা খারাপ বলেননি, তাহলে দিন তো মশাই, শতখানেক টাকা চাঁদা দিন, নিজের সংবর্ধনাটা সেরে ফেলি।

সেই ভালো, কিন্তু ঐ যাঃ, অত টাকা যে সঙ্গে নেই!

কত আছে?

দাঁড়ান, বোধহয় টাকা পাঁচেক হতে পারে।

তাই বা মন্দ কী! কাটছাঁট করে ওতেও সংবর্ধনা হয়ে যাবে। দিন, পাঁচ টাকাই দিন।

ফটিকের কেরামতি

মাঝরাত্তিরে শিয়রের জানালাটায় মৃদু ঠুকঠুক শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল ফটিকের। ঘুম তার খুব পলকা। সে উঠে হ্যারিকেনের আলোটা উস্‌কে দিয়ে জানালাটার দিকে সভয়ে চেয়ে রইল। আঁট করে বন্ধ রয়েছে পাল্লা। এত রাতে কারও আসার কথা তো নয়! চোর-ডাকাত যে নয় তা ফটিক জানে। কারণ, চোরের বাড়িতে চোর আসে না। তবে কে হতে পারে?

ফটিক গলাখাঁকারি দিয়ে খুব বিনীতভাবেই জিজ্ঞেস করল, "কে আজ্ঞে? কী চাইছেন?"

ওপাশ থেকে একটা ভারী গলা চাপা স্বরে বলল, "জানালা খোলো। দরকার আছে।"

"কী দরকার?"

"তোমার কিছু রোজগার হবে।"

রোজগার জিনিসটা ফটিক বড় ভালবাসে। রোজগারের মতো জিনিস নেই। গত দিন দশেক তার এক পয়সাও রোজগার হয়নি। দিনের বেলা সে বেড়া বেঁধে বেড়ায়। রাতের বেলা একটু-আধটু চুরিটুরির চেষ্টা করত। দুটোর কোনওটাতেই তার সুবিধে হচ্ছে না। কচু-ঘেঁচু খেয়ে দিন কাটছে। একা-বোকা মানুষ বলে চলে যায়।

ফটিক বুকে একটু সাহস এনে জানালাটা খুলল। কিন্তু বাইরে অন্ধকারে কাউকে দেখা গেল না। ফটিক একটু ভয়ে-ভয়ে উঁকিঝুঁকি দিল। হঠাৎ দস্তানা-পরা একখানা হাত তলার দিক থেকে উঠে এসে কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট ছুঁড়ে দিল তার পায়ের কাছে। ফটিক চমকে উঠে নিচু হয়ে প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিল। বেশ ভারী জিনিস।

বাইরে থেকে ভারী গলাটা বলল, "ওটা একটা পিস্তল। গুলি ভরা। সঙ্গে পাঁচশো টাকা আছে। কাজটা করতে পারলে আরও পাঁচশো।"

পিস্তল! ফটিকের হাত-পা কাঁপতে লাগল। বলল, "আজ্ঞে এ যে ভয়ঙ্কর জিনিস।"

"শুনতে ভয়ঙ্কর, ব্যবহার করা খুব সোজা।"

"কাজটা কী বলবেন?"

"বঙ্কুবাবুর মেয়ের বিয়ে পরশুদিন। হাজার লোকের নেমন্তন্ন। দেড়শো বরযাত্রী

আসবে। বাজি-টাজি ফাটবে। তোমার কাজটা হল, গোলেমালে হরিবোল। ভিড়ের মধ্যে এক ফাঁকে বঙ্কুবাবুর কাছাকাছি চলে যাবে। নলটা পিঠের বাঁ দিকে ঠেকাবে, ঘোড়াটা টেনে দেবে, ব্যস।"

"ওরে বাবা!" ফটিক ঘামতে লাগল।

"কোনও ভয় নেই। সন্ধে সাতটা থেকে বাজি ফাটবে। শব্দটা কেউ লক্ষই করবে না। তাড়াহুড়ো না করে ভিড়ে মিশে দাঁড়িয়ে থাকবে, আহা-উহু করবে। থানা থেকে পুলিশ আসতে অনেক দেরি হবে। ততক্ষণে বেরিয়ে নদীর ধারে বটতলার বাঁধানো চাতালের কাছে গিয়ে দেখবে ইট চাপা দেওয়া আরও পাঁচশো টাকা রয়েছে। টাকাটা নিয়ে পিস্তলটা ওখানেই রেখে চলে আসবে। তোমার কিছু হবে না। কোনও ভয় নেই। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে তিনদিনের মধ্যে তোমাকে খুন করা হবে।"

ফটিক আঁতকে উঠে বলল, "তা বঙ্কুবাবুকে কেন আপনারাই সাবাড় করছেন না? আমি যে জীবনে খুনখারাপি করিনি।"

"আমাদের অসুবিধে আছে। কাজটা তোমাকেই করতে হবে।"

"আমি কি পারব আজ্ঞে?"

কেউ কোনও জবাব দিল না। একটা পায়ের শব্দ দূরে চলে গেল।

ফটিক ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ল। তার মাথা ঘুরছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, বুক এমন ধড়ফড় করছে যেন তবলার লহরা, খানিকক্ষণ বসে থেকে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল। তারপর মোড়কটা খুলে পিস্তল দেখল। এসব জিনিস সে চোখেও দেখেনি আগে। বিদঘুটে চেহারা, তাকালেই ভয় হয়।

রাতে আর ফটিকের ঘুম হল না। সারারাত আকাশ-পাতাল ভেবে মাথাটাই গরম হয়ে গেল। খুনখারাপি তার লাইন নয়। রক্ত দেখলে সে এখনও ভিরমি খায়। সে সামান্য চুরিটুরির চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাতেও তার হাতযশ নেই। নিতান্ত অভাবে পড়েই চেষ্টা করতে হয়, নইলে চুরিও তার লাইন নয়। দুটো পেটের ভাত জোগাড় হলে সে কস্মিনকালেও চুরি করত না। কিন্তু এরা যে তাকে খুনোখুনিতে কেন নামাতে চাইছে তা সে বুঝতে পারছে না। খুন না করতে পারলে খুন হতে হবে—কী সব্বেনেশে কথা! ঘন ঘন জল খেতে খেতে তার পেট জয়ঢাক হয়ে গেল, তবু বারবার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

সকালবেলা মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ দাওয়ায় রসে রইল ফটিক। তার বাটিভর্তি পান্তা পড়ে রইল। খিদেটা চাগাড় দিচ্ছে না! কাল বঙ্কুবাবুর মেয়ের বিয়ে। আর কালকেই তাঁকে খুন করতে হবে।

মেয়ের বিয়ে বেশ জাঁকিয়েই দিচ্ছেন বঙ্কুবাবু। তাঁর মেলা পয়সা। চার-পাঁচ

রকমের ব্যবসা আছে। বঙ্কুবাবুর বাড়ি ফটিকের একরকম গা ঘেঁষেই। রোজ দু'বেলা যাতায়াতের পথে সে দেখেছে, বিয়ের মস্ত আয়োজন হচ্ছে। বিশাল শামিয়ানা, দেবদারু দিয়ে তোরণ হচ্ছে, নহবত বসেছে। মেলা লোক খাটছে দিনরাত। দুঃখের বিষয়, এ-বিয়েতে ফটিকের নেমন্তন্ন নেই। হওয়ার কথাও নয়। তার মতো লোককে পোঁছে কে?

ভয়ে ফটিকের কেমন যেন হাঁফ ধরে যাচ্ছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কিন্তু কী করবে তা বুঝতে পারছে না। বঙ্কুবাবুর মতো পাজি লোক মারা গেলে তার কিছু যায় আসে না। কিন্তু খুন করাটায় তার ঘোর আপত্তি হচ্ছে।

ফটিকের মাথায় নানা ফিকির খেলছে। কিন্তু কোনওটাই মনোমতো নয়।

একবার মনে হল, পালিয়ে যাবে। কিন্তু পালানোটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যারা তার পেছনে লেগেছে, তারা হয়তো নজর রাখছে। পুলিশের কাছ যাবে? গিয়ে লাভ নেই, পুলিশ তার কথা বিশ্বাস করবে না। উলটে পিস্তল রাখার দায়ে হাজতে পুরবে। বঙ্কুবাবুকে সব ভেঙে বলবে? লাভ কী? তিনি খুন না হলে সে নিজেই যে খুন হবে।

দুপুর অবধি মাথাটা পাগল-পাগল লাগল। তারপর নুন-লঙ্কা-তেঁতুল দিয়ে পান্তাটা খেয়ে নিল সে। পেট ঠাণ্ডা হল। মাথাটাও যেন একটু শীতল লাগতে লাগল। দাওয়ায় মাদুর পেতে শুয়ে সে ভাবতে লাগল। কে হতে পারে লোকটা?

খুন করতে চায় কেন? তাকে দিয়েই খুনটা করাতে চায় কেন? বঙ্কুবাবুকে মেরে কার কী লাভ?

হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ফটিক। একখানা কথা মনে পড়ে গেল তার। মাস তিনেক আগে বঙ্কুবাবুর বাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে মুনিশ খাটানো হয়েছিল সেই দলে ফটিকও ছিল। সারাদিন খাটিয়ে মাত্র পাঁচটি টাকা মজুরি দিয়েছিলেন। বঙ্কুবাবু। খাবার জুটেছিল চিঁড়ে আর গুড়। তবে বড়ঘরের জানালার নীচে আগাছা কাটার সময় ফটিকের কানে একটা কথা এসেছিল। ফটিকবাবু যেন কাকে বলেছেন, "ওই গ্যাঁড়াই আমাকে মারবে একদিন। তারপর সব গাপ করবে।"

এই গ্যাঁড়াটি কে তা ফটিক জানে না। কিন্তু চুপ করে বসে থাকলে তো সমস্যার সমাধান হবে না। সে পিস্তলটা বিছানার তোশকের তলায় লুকিয়ে রাখল। পাঁচশোটা টাকা ট্যাঁকে গুঁজল। গায়ে জামা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বঙ্কুবাবুদের বাড়িতে সানাই বাজছে। মেলা লোকলস্কর খাটছে। তোরণে ফুলের তৈরি প্রজাপতি বসানো হয়েছে। লুচি ভাজার গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে। ফটিক বাড়িতে ঢুকে চারদিক দেখতে লাগল। তার মতো আরও অনেকেই দেখতে এসেছে। ফটকে ফটকে দারোয়ানদের তেমন কড়াকড়ি নেই।

শামিয়ানার ওপরে বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন লাগানো হচ্ছে। ঘাড় উঁচু করে দেখছিল ফটিক। হঠাৎ কে যেন বজ্রমুষ্ঠিতে তার ডান হাতের কানু চেপে ধরে বলে উঠল, "এই যে!"

ফটিক এমন আঁতকে উঠল যে মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। তোতলাতে তোতলাতে বলল, "আজ্ঞে আমি না। আমি কিছু করিনি।"

বঙ্কুবাবু কিন্তু মোটেই বিচলিত হলেন না। হাসি হাসি মুখ করে বললেন, "তুই ফটিক না?"

"যে আজ্ঞে।"

বঙ্কুবাবু হাসি হাসি মুখ করেই বলেন, "একটু উপকার কর তো বাবা। কুমুদের দোকানে পাঁচ সের সুপুরি রাখা আছে, আনার লোক নেই। এক ছুটে গিয়ে নিয়ে আয় তো।"

ফটিক ধাতস্থ হল। আঁতকে ওঠা ভাবটা চট করে কেটে গেল তার। কাল যে এই লোকটাকেই খুন করার কথা। ঘাবড়ালে চলবে কেন। হঠাৎ বলে বসল, "লোক নেই কেন বঙ্কবাবু? গ্যাঁড়াকেই তো পাঠাতে পারেন।"

বঙ্কুবাবু অবাক হয়ে বললেন, "গ্যাঁড়া, গ্যাঁড়াটা আবার কে?"

ফটিক সামান্য ঘাবড়ে গিয়ে বলে, "ও যে আপনার কী যেন হয়!"

আন্দাজে ঢিল মেরেছিল। বোধহয় লাগল না।

বঙ্কুবাবু অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে তার দিকে চেয়ে

বললেন, "তোর তো সাহস কম নয়! জামাইকে দিয়ে সুপুরি আনাতে বলছিস! আর আমার বড় জামাই কি তোর ইয়ার যে গ্যাঁড়া-গ্যাঁড়া করছিস?"

ফটিক হাতজোড় করে বলল, "আজ্ঞে আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, কত ভুলভাল বলে ফেলি!"

"যা সুমুখ থেকে। সুপুরিটা নিয়ে আয়।"

পথে হাঁটতে হাঁটতে দুইয়ে দুইয়ে চার করল ফটিক। বঙ্কুবাবুর দুটো মেয়ে, ছেলে-টেলে নেই। বঙ্কুবাবু মারা গেলে মেয়েরা ওয়ারিশান। বড় জামাই গ্যাঁড়া। তাকে চেনে না ফটিক। তবে একটা গন্ধ পাচ্ছে।

সুপুরি পৌঁছে দেওয়ার পর বঙ্কুবাবু একটা সিকি বকশিশ দিলেন। তারপর হাসিমুখ করেই বললেন, "হঠাৎ গ্যাঁড়ার কথা বললি কেন বল দিকি!"

"আজ্ঞে বুঝতে পারিনি।"

বঙ্কুবাবু একখানা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আপনমনেই বললেন, "অকালকুষ্মাণ্ড। ছিবড়ে করে ছেড়ে দিচ্ছে আমাকে। আজ এটা দাও, কাল সেটা দাও।"

ফটিক বশংবদ দাঁড়িয়ে থেকে শুনে নিচ্ছিল।

"কী শুনছিস দাঁড়িয়ে?"

"আজ্ঞে, গালাগাল দিচ্ছেন তো, চলে গেলে বেয়াদপি হবে যে!"

"গালাগাল তোকে দিইনি!"

"তবে কাকে?"

"নিজের কপালকে। ওই যে দেখছিস না, চেহারা বাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই আমার কপাল।"

যাকে দেখিয়ে দিলেন বঙ্কুবাবু তার বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। রং ফরসা, কোঁচানো ধুতি আর মুগার পাঞ্জাবি পরে ঘুরে ঘুরে ব্যবস্থা দেখছে।

"বেশ জামাইটি আপনার বঙ্কুবাবু।"

"হ্যাঁ, একেবারে মনের মতো। এখন যা তো। জ্বলছি নিজের জ্বালায়।"

ফটিক লোকটিকে ভাল করে দেখে নিল। যাতে ভুল না হয়। তারপর ধীরে সুস্থে ফিরে এল। মনটা একটু হালকা লাগছে।

মাঝরাতে আবার জানালায় ঠকঠক। ফটিক জানালা খুলে অমায়িক গলায় বলে, "যে আজ্ঞে।"

ভারী গলা বলল, "মনে আছে তো!"

"খুব মনে আছে। বাকি টাকাটা দেবেন নাকি?"

"কাল পাবে। জায়গামতো। কাজে যদি গণ্ডগোল হয় তো মরবে।"

"আর বলতে হবে না।"

পরদিন ফটিক দোকানে গিয়ে ভাল করে সাঁটিয়ে খেল। দুপুরে ঘুমোল, বিকেলে

একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে হাজির হল বঙ্কুবাবুর বাড়িতে। সারা বাড়ি আজ যেন রাজবাড়ির মতো দেখাচ্ছে আলোয় আলোয় স্বপ্নপুরী। ভিড়ে ভিড়াক্কার। বরসহ বরযাত্রীরাও সব এসে গেল সন্ধের মুখেই। গোলাপজল ছিটোনো হচ্ছে চারদিকে। বঙ্কুবাবু সবাইকে "আসুন, বসুন" করছেন। পাশে গ্যাঁড়া। সেও খুব সেজেছে।

বাজি পোড়ানো শুরু হল। বাজির শব্দে চারদিক একেবারে গমগম করতে লাগল। হঠাৎ ফটিক লক্ষ করল, গ্যাঁড়া এই এত ভিড়ের মধ্যেও আড়চোখে তাকে নজরে রাখছে।

ফটিক মনে মনে হাসল। গ্যাঁড়া এক মুহূর্তের জন্য বঙ্কুবাবুর কাছ থেকে নড়ছে না।

লোকজন যখন শামিয়ানার বাইরে এসে ভিড় করে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে আকাশে আতশবাজি দেখছে, ঠিক সেইসময় ফটিক এগিয়ে গিয়ে গ্যাঁড়ার পেছনে দাঁড়াল। নলটা তার পিঠে ঠেকিয়ে বলল, "ইষ্টনাম স্মরণ করুন বঙ্কুবাবু!"

গ্যাঁড়া হঠাৎ আঁতকে উঠে বলল, "আমি বঙ্কুবাবু নাকি? আহাম্মক কোথাকার! ওই তো বঙ্কুবাবু।"

ফটিক মাথা চুলকে বলল, "ইস, বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছিল তো!"

গ্যাঁড়া দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "গাধা কোথাকার! যাও যাও, কাজ সারো, আর সময় নেই!"

ফটিক একগাল হাসল, "বটে! তা টাকাটা জায়গামতো আছে তো!"

গ্যাঁড়া মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "আছে।"

"ঠিক তো!"

গ্যাঁড়া ঘুরে তার গালে একখানা চড় কষিয়ে দিয়ে বলল, "বেয়াদপ কোথাকার!"

ব্যাপার দেখে বঙ্কুবাবু এগিয়ে এলেন, "এ কী! কী হয়েছে?"

ফটিক গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "হয়নি। তবে হবে।"

"কী হবে ফটিক?"

গ্যাঁড়ার দিকে চেয়ে বলল, "বলব বাবু?"

গ্যাঁড়ার মুখটা ছাইবর্ণ হয়ে গেল। আচমকা সে ভিড় ঠেলে অন্ধের মতো ছুটতে লাগল। তাকে আর দেখা গেল না।

বঙ্কুবাবু চালাক লোক। ফটিকের হাত ধরে ভিড় থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন চট করে।

"ফটিক, ব্যাপারখানা কী?"

ফটিক লজ্জায় অধোবদন হয়ে সবই বলল। খুব অপরাধী মুখ করে। কিন্তু

বঙ্কুবাবুর মুখখানা চকচক করতে লাগল। একটু খুশির গলাতেই বললেন, "ব্যাটা অনেকদিন ধরেই নানা মতলব আঁটছিল। তুই বেজায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিস। তোর বুদ্ধি আছে। ও ব্যাটা আর ইদিকে আসবে না শিগগির!"

বঙ্কুবাবু খুশি হলেই হাত-উপুড়। আর তাঁর হাত-উপুড় মানে পর্বত। বঙ্কুবাবু ফটিককে একখানা দোকান করে দিলেন। বেশ বড়সড় মুদির দোকান। আর বটগাছের তলায় পাঁচশো টাকাও পেয়ে গিয়েছিল সে। পিস্তলটা বঙ্কুবাবুকে দিয়েছিল ফটিক। বঙ্কুবাবু বললেন, "এটা আমারই জিনিস। গ্যাঁড়া গেঁড়িয়েছিল।"

তা কথাটা হল, ফটিককে আর উঞ্ছবৃত্তি করতে হচ্ছে না।

কৃপণ

কদম্ববাবু মানুষটা যত না গরিব তার চেয়েও ঢের বেশি কৃপণ। তিনি চণ্ডীপাঠ করেন কি না কে জানে, তবে জুতো সেলাই যে করেন তা সবাই জানে। আর করেন মুচির পয়সা বাঁচাতে। তবে আরও একটা কারণ আছে। একবার এক মুচি তাঁর জুতো সেলাই করতে নারাজ হয়ে বলেছিল, এটা তো জুতো নয়, জুতোর ভূত। ফেলে দিন গে। বাস্তবিকই জুতোজোড়া এত ছেঁড়া আর তাপ্পিমারা যে সেলাই করার আর জায়গাও ছিল না। কিন্তু কদম্ববাবু দমলেন না। একটা গুনছুঁচ আর খানিকটা সুতো জোগাড় করে নিজেই লেগে গেলেন সেলাই করতে।

জুতো সেলাই থেকেই তাঁর ঝোঁক গেল অন্যান্য দিকে। জুতো যদি পারা যায় তাহলে ছাতাই বা পারা যাবে না কেন? সুতরাং ছেঁড়া ভাঙা ছাতাটাও নিজেই সারাতে বসে গেলেন। এরপর ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ, ছুতোরের কাজ, ছুরি-কাঁচি ধার দেওয়া, শিল কাটানো, ফুটো কলসি ঝালাই করা, ছোটখাটো দর্জির কাজ—সবই নিজে করতে লাগলেন। এর ফলে যে উনি বাড়ির লোকের কাছে খুব বাহবা পান তা মোটেই নয়। বরং তাঁর বউ আর ছেলেমেয়েরা তাঁর এই কৃপণতায় খুবই লজ্জায়-লজ্জায় থাকে। বাইরের লোকের কাছে তাদের মুখ দেখানো ভার হয়।

কিন্তু কদম্ববাবু নির্বিকার। পয়সা বাঁচানোর যতরকম পন্থা আছে সবই তাঁর মাথায় খেলে যায়। তাঁর বাড়িতে ঝি-চাকর নেই। জমাদার আসে না। নর্দমা পরিষ্কার থেকে বাসন মাজা সবই কদম্ববাবু, তাঁর বউ আর ছেলেমেয়েরা করে নেয়। ছোট ছেলে বায়না ধরল, ঘুড়ি-লাটাই কিনে দিতে হবে। কদম্ববাবু একটুও না ঘাবড়ে বসে গেলেন ঘুড়ি বানাতে। পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে ঘুড়ি আর কৌটো ছ্যাঁদা করে তার মধ্যে একটা ডান্ডা গলিয়ে লাটাই হলো। ঘুড়িটা উড়ল না বটে, কিন্তু কদম্ববাবুর পয়সা বেঁচে গেল। এহেন কদম্ববাবু একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন। চার মাইল রাস্তা তিনি হেঁটেই যাতায়াত করেন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মাঝরাস্তায় ঝেঁপে বৃষ্টি এল। সস্তা ফুটো ছাতায় জল আটকাল না। কদম্ববাবু ভিজে ভূত হয়ে যাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি একটা পুরনো বাড়ির রকে উঠে ঝুলবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হঠাৎ পিছনে প্রকাণ্ড দরজাটা খুলে গেল। একজন বুড়ো মতো লোক মুখ বাড়িয়ে একগাল হেসে বলল, এই যে শ্যামবাবু। এসে গেছেন তা হলে? আসুন,

আসুন, ভিতরে আসুন।

কদম্ববাবু তটস্থ হয়ে বললেন, আমি তো শ্যামবাবু নই।

না-হলেই বা শুনছে কে? কর্তাবাবু দাবার ছক সাজিয়ে বসে আছেন যে! দেরি হলে কুরুক্ষেত্তর করবেন। এই কি রঙ্গ-রসিকতার সময়? আসুন, আসুন।

কদম্ববাবু সভয়ে বললেন, আমি তো দাবা খেলতে জানি না।

লোকটা আর সহ্য করতে পারল না। কদম্ববাবুর হাতটা ধরে দরজার মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, আচ্ছা লোক যা হোক। আপনি রসিক লোক তা আমরা সবাই জানি। তা বলে সব সময়ে কি রসিকতা করতে হয়?

ভিতরে ঢুকে কদম্ববাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। এই সব পুরনো বনেদি বাড়িতে তিনি কখনও ঢোকেননি। যেদিকে তাকান, চোখ যেন ঝলসে যায়।

মার্বেল পাথরে বাঁধানো মেঝে থেকে শুরু করে ঝাড়বাতি অবধি সবই টাকার গন্ধ ছড়াচ্ছে।

তিনি যে শ্যামবাবু নন, তাঁকে যে ভুল লোক ভেবে এ-বাড়িতে ঢোকানো হয়েছে, এ-কথাটা ভাল করে জোর দিয়ে বলার মতো অবস্থাও কদম্ববাবুর আর রইল না। তিনি চারদিকে চেয়ে মনে-মনে হিসেব করতে লাগলেন, এই মার্বেল পাথরের কত দাম, কত দাম ওই দেয়ালগিরির.....

ভেজা ছাতা থেকে জল ঝরে মেঝে ভিজে যাচ্ছিল। লোকটা হাত বাড়িয়ে ছাতাটা হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে বলল, এঃ শ্যামবাবু, এই ছেঁড়া, তাপ্পি-দেওয়া ছাতা কোথা থেকে পেলেন? আপনার সেই দামি জাপানি ছাতাখানার কি হলো?

কদম্ববাবু শুধু হতভম্বের মতো বললেন, জাপানি ছাতা?

লোকটা হঠাৎ তাঁর পেটে একটা চিমটি কেটে বলল, আপনার মতো শৌখিন মানুষ ক'টা আছে বলুন।

ছেঁড়া জুতোয় জল ঢুকে সপ্‌সপ্‌ করছিল। কদম্ববাবু জুতোজোড়া সন্তর্পণে ছেড়ে রাখলেন একধারে।

কিন্তু লোকটার চোখ এড়ানো গেল না। জুতোজোড়া দেখতে পেয়ে লোকটা আঁতকে উঠে বলল, সেই সোনালি সুতোর কাজ-করা নাগরা জোড়া কোথায় গেল আপনার? তার বদলে এ কী?

কদম্ববাবু কৃপণ বটে, কিন্তু তিনি নিজেও জানেন যে তিনি কৃপণ। সাধারণ কৃপণেরা টেরই পায় না যে তারা কৃপণ। তারা ভাবে যে তারা যা করছে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কদম্ববাবু তাদের মতো নন। তাই লোকটার কথায় ভারি লজ্জা পেলেন তিনি। এমন-কি তিনি যে শ্যামাবাবু নন, এ-কথাটাও হঠাৎ ভুলে গিয়ে তিনি বলে ফেললেন, বর্ষাকাল বলে নাগরা জোড়া পারিনি।

লোকটা একটু তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলল, যার দেড়শো জোড়া জুতো সে আবার সমান্য নাগরার মায়া করবে, এটা কি ভাবা যায়? শ্যামবাবু ছেঁড়া জুতো পরে বাবুর বাড়ি আসছেন, এ যে কলির শেষ হয়ে এল!

কদম্ববাবু এ-কথা শুনে সভয়ে আড়চোখে নিজের পোশাকটাও দেখে নিলেন। পরনে মিলের মোটা ধুতি, গায়ে একটা সস্তা ছিটের শার্ট। শ্যামবাবু নিশ্চয়ই এই পোশাক পরেন না।

যেন তাঁর মনের কথাটি টের পেয়েই লোকটা বলে উঠল, নাঃ, আজ বোধহয় আপনি ছদ্মবেশ ধারণ করেই এসেছেন শ্যামবাবু। তা ভালো। বড়লোকদেরও কি আর মাঝে-মাঝে গরিব সাজতে ইচ্ছে যায় না। নইলে শ্যামবাবুর গায়ে তালিমারা জামা, পরনে হেটো ধুতি হয় কী করে!

কদম্ববাবু বিগলিত হয়ে হাসলেন। বললেন, ঠিক ধরেছেন বটে।

হলঘরের পর দরদালান। আহা, দরদালানেরও কী শ্রী! দু'ধারে পাথরের সব মূর্তি, বিশাল বিশাল অয়েল পেন্টিং পায়ের নিচে নরম কার্পেট।

এসব জিনিস চর্মচক্ষে বড় একটা দেখেননি কদম্ববাবু। তবে শুনেছেন। টাকার কতখানি অপচয় যে এতে হয়েছে তা ভেবে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। দু-ধারে সারি-সারি ঘর। দরজায় ব্রোকেড বা ওই জাতীয় জিনিসের পর্দা ঝুলছে। দেওয়ালগিরি আর ঝাড়লণ্ঠনের ছড়াছড়ি। এক-একটা ঝাড়ের দাম যদি হাজার টাকা করেও হয় কমপক্ষে.....

নাঃ, কদম্ববাবু আর ভাবতে পারলেন না।

লোকটা দরদালানের শেষে একটা চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বলল, কর্তাবাবুও আজ আপনাকে দেখে মজা পাবেন। যা একখানা ছদ্মবেশ লাগিয়ে এসেছেন আজ!

কদম্ববাবু হেঃ হেঃ করে অপ্রতিভ হাসি হাসলেন।

সিঁড়ি যে এরকম বাহারি হয় তা কদম্ববাবুর সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো কার্পেটে মোড়া এ-সিঁড়িতে পা রাখতেও তাঁর লজ্জা করছিল।

দোতলায় উঠে কদম্ববাবু একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। রাজদরবারের মতো বিশাল ঘর রুপোয় একেবারে রূপের হাট খুলে বসে আছে। যেদিকে তাকান সেদিকেই রুপো। রুপোর ফুলদানি, রুপোর ফুলের টব, রুপোর টেবিল, রুপোর চেয়ার, দেওয়ালে রুপোর বাঁধানো বড় বড় ফটো।

কদম্ববাবু চোখ পিটপিট করতে লাগলেন।

লোকটা একটু ফিচকে হেসে বলল, হলো কি শ্যামবাবুর? অ্যাঁ। এ-বাড়ি কি আপনার অচেনা? রুপোমহলে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি চলবে? কর্তাবাবু যে

সোনামহল্লায় আপনার জন্য বসে থেকে-থেকে হেদিয়ে পড়লেন! আসুন তাড়াতাড়ি।

সোনামহল্লা! কদম্ববাবুর বেশ ঘাম হতে লাগল শুনে। রুপোমহলেই যে লাখো লাখো টাকা ছড়িয়ে আছে চারধারে!

কিংখাবেরর একটা পর্দা সরিয়ে লোকটা বলল, যান, ঢুকে পড়ুন।

কদম্ববাবু কাঁপতে কাঁপতে সোনামহল্লায় ঢুকলেন। কিন্তু ঢুকেই যে কেন মূর্ছা গেলেন না সেটাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি।

সোনামহল্লার সব কিছুই সোনার। এমনকি পায়ের তলার কার্পেটটায় অবধি সোনার সুতোর কাজ। সোনার পায়াওলা টেবিল, সোনার পাতে মোড়া চেয়ার, সোনার ফুলদানি, সোনার ঝাড়লণ্ঠন। এত সোনা যে পৃথিবীতে আছে তা-ই জানা

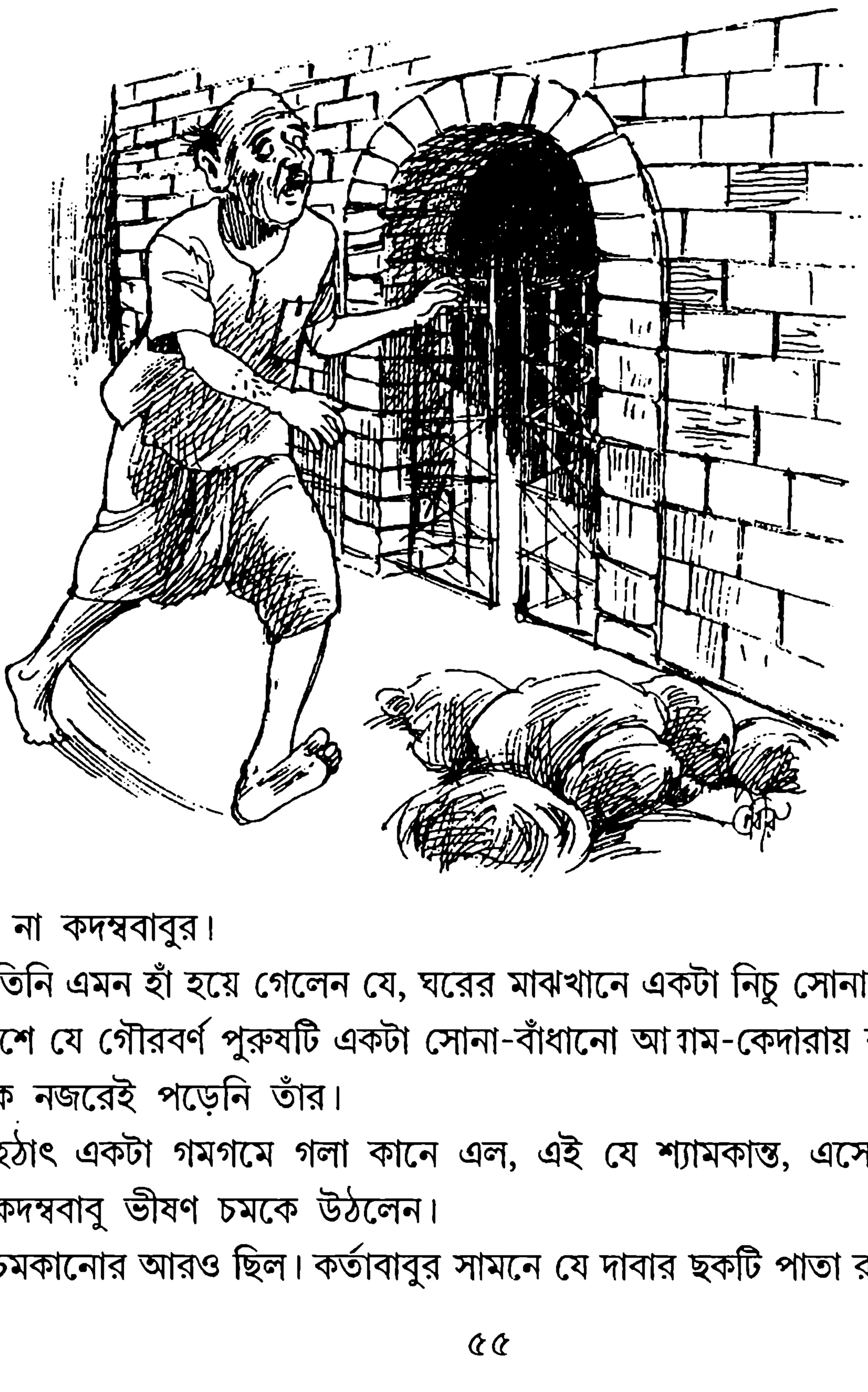

ছিল না কদম্ববাবুর।

তিনি এমন হাঁ হয়ে গেলেন যে, ঘরের মাঝখানে একটা নিচু সোনার টেবিলের ওপাশে যে গৌরবর্ণ পুরুষটি একটা সোনা-বাঁধানো আরাম-কেদারায় বসেছিলেন, তাঁকে নজরেই পড়েনি তাঁর।

হঠাৎ একটা গমগমে গলা কানে এল, এই যে শ্যামকান্ত, এসো।

কদম্ববাবু ভীষণ চমকে উঠলেন।

চমকানোর আরও ছিল। কর্তাবাবুর সামনে যে দাবার ছকটি পাতা রয়েছে সেটা

যে শুধু সোনা নিয়ে তৈরি তা-ই নয়, প্রত্যেকটা খোপে আবার হীরে, মুক্তো, চুনী আর পান্না বসানো। একধারে সোনার ঘুঁটি অন্য ধারে রুপোর। প্রত্যেকটি ঘুঁটির মাথায় আবার এক কুচি করে হীরে বসানো।

বোসো, বোসো হে শ্যামকান্ত। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। মনে আছে তো আজ আমাদের বাজি রেখে খেলা?

এই হলো আমার বাজি।

এই বলে কর্তাবাবু একটা নীল ভেলভেটে মোড়া বাক্সের ঢাকনা খুলে টেবিলের একপাশে রাখলেন।

কদম্ববাবু দেখলেন, বাক্সের মধ্যে মস্ত একটা মুক্তো। মুক্তো যে এত বড় হয় তা জানা ছিল না তাঁর।

তুমি কি বাজি রাখবে শ্যামবাবু?

কদম্ববাবু আমতা-আমতা করে বললেন, আমি গরিব মানুষ, কী আর বাজি রাখব বলুন।

কর্তাবাবু ঘর কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ অট্টহাসি হেসে বললেন, গরিবই বটে। বছরে যার কুড়ি লাখ টাকা আয়, সে আবার কেমন গরিব?

আজ্ঞে আপনার তুলনায় আমি আর কী বলুন!

কর্তাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, সে-কথাটা সত্যি শ্যামবাবু। আমার মেলা টাকা। এত টাকা যে আজকাল আমার টাকার ওপর ঘেন্না হয়। খুব ঘেন্না হয়।

টাকার ওপর ঘেন্না! কদম্ববাবুর মুখটা হাঁ হাঁ করে উঠল। কর্তাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, আজ সকালে মনটা খুব খারাপ ছিল। কিছুতেই ভাল হচ্ছিল না। কী করলুম জানো? দশ লক্ষ টাকার নোট আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিলুম।

অ্যাঁ?

শুধু কি তাই? ছাদে উঠে মোহর ছুঁড়ে ছুঁড়ে কাক তাড়ালুম। এতে একটু মনটা ভাল হলো। তারপর জুড়িগাড়ি করে হাওয়া খেতে বেরিয়ে এক হাজারটা হীরে আর মুক্তো রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে এলুম।

কদম্ববাবু দাঁত দাঁত চেপে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিলেন। লোকটা বলে কী?

কর্তাবাবু বললেন এসো, চাল দাও। তুমি কী বাজী রাখবে বললে না?

কদম্ববাবু মুখটা কাঁচুমাচু করে ভাবতে লাগলেন।

কর্তাবাবু নিজেই বললেন, টাকাপয়সা হীরে-জহরত তো আমার দরকার নেই। তুমি বরং তোমার পকেটের ওই কলমটা বাজি ধরো।

কলম! কদম্ববাবু শিউরে উঠলেন। মাত্র আট আনায় ফুটপাথ থেকে কেনা। তবু কদম্ববাবু উপায়ান্তর না পেয়ে কলমটাই রাখলেন মুক্তোর উল্টোদিকে।

কিন্তু চাল? দাবার যে কিছুই জানেন না কদম্ববাবু।

চোখ বুজে একটা ঘুঁটি এগিয়ে দিলেন কদম্ববাবু।

কর্তাবাবু বললেন, সাবাস!

কদম্ববাবু চোখ মেলে একটা শ্বাস ছাড়লেন। তারপর বুদ্ধি করে কর্তাবাবুর দেখাদেখি কয়েকটা চাল দিয়ে ফেলেন।

হঠাৎ কর্তাবাবু সবস্মিয়ে বলে উঠলেন, এ কী! তুমি যে কিস্তি দিয়ে বসেছ আমাকে! অ্যাঁ! এ কী কাণ্ড! আমি যে মাৎ!

তার পরেই কর্তাবাবু হঠাৎ ঘর কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে কদম্ববাবুর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। ভয়ে চোখও বুজে ফেললেন।

যখন চোখ মেললেন তখন কদম্ববাবু হাঁ।

কোথায় সোনার ঘর? কোথায় রুপোর ঘর? কোথায় সেই ঝাড়বাতি আর দেওয়ালগিরি? কোথায় আসবাবপত্র? এ যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ভাঙা সোঁদা একটা পোড়ো বাড়ির মধ্যে বসে আছেন তিনি! চারদিকে চুন বালি খসে ডাঁই হয়ে আছে। চতুর্দিকে মাকড়সার জাল! ইঁদুর দৌড়চ্ছে।

কদম্ববাবু আতঙ্কে একটা চিৎকার দিলেন। তারপর ছুটতে লাগলেন। সেই বাড়িরই এমন দশা কে বিশ্বাস করবে? মেঝের পাথর সব উঠে গেছে, সিঁড়ি ভেঙে ঝুলে আছে, দরদালানের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে.....

কদম্ববাবু পড়ি-কি-মরি করে ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে কোনোরকমে বাইরের দরজায় পৌঁছলেন। দরজাটা অক্ষত আছে। কদম্ববাবু দরজাটার কড়া ধরে হ্যাঁচকা টান মারতে সেটি খুলে গেল।

কদম্ববাবু রাস্তায় নেমে ছুটতে লাগলেন। বৃষ্টি পড়ছে, তাঁর ছাতা নেই, পায়ে জুতোও নেই। ভাঙা পোড়ো বাড়ির মধ্যে কোথায় পড়ে আছে।

কদম্ববাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর ভাবলেন, সত্যিই তো। টাকা বাঁচিয়ে হবেটে কী? শেষে তো ওই ভূতের বাড়ি।

বুক ফুলিয়ে কদম্ববাবু একটা দোকানে ঢুকে একটা বাহারি ছাতা কিনে ফেলেন। জুতোর দোকানে ঢুকে কিনলেন দামি একজোড়া জুতো।

তারপর আবার ভাবতে লাগলেন। শুধু নিজের জন্য কেনাকাটা করাটা ভাল দেখাচ্ছে না।

তিনি আবার দোকানে ঢুকে গিন্নির জন্য শাড়ি আর ছেলেমেয়েদের জন্য জামা-কাপড়ও কিনে ফেললেন।

মনটা বেশ ভাল হয়ে গেল তাঁর।

পড়শি

ফটিকবাবু যে! নমস্কার।

নমস্কার। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।

চেনার কথাও নয়। আমার নাম হরিদাস।

বাঃ বেশ। তা কী দরকার বলুন।

আজ্ঞে না, দরকার কিছু নেই। এমনি এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম তো, তাই একটু খোঁজ নিলাম আর কি। পাড়াপ্রতিবেশীদের খোঁজ খবর নেওয়াটা তো একটা কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে নাকি?

সে তো ঠিকই। কিন্তু আপনি কি আমার প্রতিবেশী? কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

প্রতিবেশী বৈকি। প্রতিবেশী ছাড়া কী আর বলা যায়। কাছেপিঠেই থাকি।

আমি অবশ্য পাড়ায় বেশি যোগাযোগ করি না। তাহলেও প্রতিবেশীদের সবাইকেই চিনি। আপনাকে কিন্তু চেনা চেনা ঠেকছে না।

এই তো এবার থেকে ঠেকবে। কিন্তু ফটিকবাবু, আপনি প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করেন না কেন?

তার অনেক কারণ আছে মশাই। প্রতিবেশীরা বড্ড হাঁড়ির খবর নেয়, কুটকচালি করে। এর কথা ওকে বলে বেড়ায়, ধার চায়, জিনিসপত্র নিয়ে ফেরত দেয় না, টিটকিরি মারে, আরও অনেক ব্যাপার আছে।

কিন্তু ফটিকবাবু, আপনার পুবদিকে যে জ্ঞানবাবু থাকেন তিনি তো মস্ত সজ্জন, ধর্মভীরু মানুষ। তাঁর বাড়ি থেকে ভিখিরি কখনও খালি হাতে ফেরে না।

জ্ঞানবাবু সজ্জন! কে আপনাকে কথাটা বলেছে বলুন তো! বাইরে অমন ভালোমানুষটি সেজে থাকলেই হলো? সজ্জনই যদি হবে তাহলে ওর বাড়িতে ঝি-চাকর টেঁকে না কেন বলুন তো! কেনই বা গয়লা আর মুদি এসে পাওনা টাকার জন্য চেঁচামেচি করে যায়। কেনই বা মাসে একবার করে কাবলিওয়ালা আসে! মুনসেফ কোর্টের কেরানি হয়েও ওঁর বউয়ের গা-ভর্তি গয়না কোত্থেকে আসছে বলুন তো! ওঁর ছেলেপুলেদের চেহারা অমন নধরকান্তি হয় কি করে তা কখনও ভেবে দেখেছেন? কি করেই বা উনি পুরোনো মেঝে চেঁছে মার্বেল বসালেন। শালা বিয়ে করল, উনি নতুন বৌকে নেকলেস দিয়ে আশীর্বাদ করার

মুরোদ কোথায় পেলেন? ভিখিরিকে ভিক্ষে দেয় বলে আপনি গদগদ। কিন্তু এটা তো স্বীকার করবেন যে, ভিখিরিকে ভিক্ষে দেওয়ার মানে আলস্য ও অপদার্থকে প্রশ্রয় দেওয়া! আর এই প্রশ্রয়ের ফলে ভিখিরির সংখ্যা বাড়ছে!

না ফটিকবাবু, জ্ঞানবাবু সম্পর্কে এত গুপ্ত কথা আমার জানা ছিল না। এসব শুনে মনে হচ্ছে জ্ঞানবাবুকে যা ভেবেছিলাম বোধহয় তা নয়।

মোটেই নয় মশাই, মোটেই নয়, গভীর রাত অবধি দেখবেন ওর ওই চিলেকোঠার ঘরে আলো জ্বলে। খুটখুট শব্দ হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওখানে চোরাই কোনও কারাবারের ঠেক করেছে। হয় স্মাগলিং, নয়তো ড্রাগ বা ওরকম কিছু।

একটু ঠেকায় পড়ে শ পাঁচেক টাকা ধার নিয়েছিলাম, তা মশাই, বছর ঘুরতে দেয় না। তাগাদায় তাগাদায় অস্থির করে ফেলল। পিছনের বাগানের বেড়া বাঁধতে গিয়ে ওর বাড়ির দাটা চেয়ে এনেছিলাম, ফেরত দিতে দিন সাতেক দেরি হয়েছে বলে জ্ঞানের বউ কত কথা শুনিয়ে গেল। ওর বড় মেয়ের বিয়ের একটা সম্বন্ধ হয়ে হয়েও হলো না, এখন বলে বেড়াচ্ছে আমরাই নাকি ভাঙচি দিয়েছি। জ্ঞান যদি সজ্জন হয় তাহলে রাবণরাজা, হিরণ্যকশিপু বা হিটলারও সজ্জন, বুঝলেন!

তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনার পশ্চিমদিকে যে মনোরঞ্জন ঘোষ থাকেন তিনি তো উঁচুদরের মানুষ। নাকি!

কী দেখে ধারণাটা হলো বলুন তো! গান গায় বলে বলছেন?

আজ্ঞে, গান নাকি খুবই ভাল গেয়ে থাকেন শুনেছি। বাজারে বেজায় নাকি নামডাক। চারদিক থেকে লোক এসে টানাটানি করে। পাড়ার ক্লাবে মোটা টাকা

চাঁদা দিয়েছেন বলে শুনেছি। বন্যাত্রাণ তহবিলে এক লাখ টাকা ঝপাৎ করে ফেলে দিয়েছেন, দুটো গরিবের ছেলেকে নাকি পড়ার খরচ দেন।

দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান। একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেললেন তো। ওসব হাওয়ায় অনেক কথা ওড়ে। ওই ওড়া কথা আবার বিশ্বাস করে বসবেন না যেন।

তাহলে কি ভিতরে অন্য কথাও আছে ফটিকবাবু?

তা আর নেই! মনো কত বড় গাইয়ে বলুন তো! কানাকেষ্ট, নাকি হেমন্ত না মান্না? তাদের পায়ের কাছে ও বসতে পারবে? আমার এক কালোয়াত বন্ধু তো বলে গেছে, ওর গলায় মোটে সুরই নেই। আমার বউ সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়ে আর রেওয়াজের সময় পেল না, তাই নইলে এতদিনে লতা, আশার কাছাকাছি পৌঁছে যেত। গীতশ্রী টাইটেলটা তো আর মুখ দেখে দেয়নি। বুঝলেন হরিদাসবাবু, গানবাজনা আমরা বুঝি। মনোর নামডাক তো হয়েছে স্রেফ পাবলিসিটি খাইয়ে। আর জায়গামতো তেল দিয়ে। নইলে ওই ফাটা বাঁশের মতো গলা কি বাজারে কলকে পেত! সাধনা বলে কিছু আছে নাকি ওর?

এত কথা তো জানা ছিল না ফটিকবাবু!

আরে জানবেন কি করে? ও তো ছুপা রুস্তম। ময়ূরটি সেজে ঘাড়ে পাউডার দিয়ে গিয়ে যখন স্টেজে বসে তখন আপনারা ওর কায়দাকানুন দেখেই গলে পড়েন। আর ওই ক্লাবের চাঁদা! তার পিছনের কাহিনী তো জানেন না। বটতলার জমিটা সস্তায় কিনে নিল গত আশ্বিনে। দখলদার উচ্ছেদ করতে ক্লাবের ছেলেদের ধরে পড়ল। তারা জমি থেকে দখলদার হটিয়ে দিয়েছিল বলে ওই টাকা। দানখয়রাতি বলে ধরে বসবেন না যেন। আর বন্যাত্রাণের টাকার কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। সত্যি কথা শুনলে আপনার মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

সত্যি কথাটা কী ফটিকবাবু?

শুনবেন? ওই লাখ টাকা বন্যাত্রাণে দিয়ে ছেলেকে এস ডি ও-র পোস্ট পাইয়ে দিয়েছে। ছেলে এখন গ্যাট হয়ে বসে দেদার ঘুষ খাচ্ছে। লাখ টাকার দশগুণ উশুল হয়ে গেছে কবে!

বটে ফটিকবাবু! এ তো সাঙ্ঘাতিক কথা।

আর ওই যে গরিব ছাত্রদের পড়ানোর ব্যাপারটা। লোকে খুব বাহবা দেয় বটে, সে আসল কথাটা জানে না বলে।

কী কথা মশাই?

খোঁজ নিলেই দেখবেন ও দুটি ছেলেই লেখাপড়ায় দারুণ ভাল। পরীক্ষায় দুর্দান্ত ফল করে থাকে। দুটিই কুলীন কায়েত, মনোরঞ্জনের পাল্টি ঘর। এবার বুঝেছেন খানিকটা?

আজ্ঞে না। ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছে।

বুঝতে চাইলে ঠিকই বুঝতেন। মনোরঞ্জনের দুটি কালিকিস্টি ধুমসী, থলথলে মোটা হতকুচ্ছিৎ মেয়ে আছে। মনোরঞ্জন ভালই জানে যে তাদের স্বাভাবিক নিয়মে বিয়ে দেওয়া মুশকিল হবে। তাই ওই ছেলেদুটিকে বেঁধে রাখছে। ওরা হলো মনোরঞ্জনের হবু জামাই। ওটা দয়াধর্ম বলে মনে করবেন না যেন। ওটা আসলে দাদন।

কিন্তু আমি যে শুনেছি মনোরঞ্জনবাবুর মেয়েরা ভারী সুন্দরী। লেখাপড়ায় ভাল। গান জানে, সে কি তাহলে ভুল?

খুব ভুল মশাই, খুব ভুল শুনেছেন। দূর থেকে খারাপ দেখায় না বটে, মেকআপ করে থাকে তো। আসল চেহারা আমরা জানি।

তারা কি লেখাপড়া বা গান-বাজনায় ভাল নয়?

চৌদ্দটা মাস্টার রাখলে কি আমার তিন তিনটে মেয়ে ফার্স্ট সেকেন্ড হতে পারত না হরিদাসবাবু? আর কলেজের সোশ্যাল আর পাড়ার ফাংশানে গাইলেই কি গায়িকা হওয়া যায়? সকালে যখন মেয়ে দুটো সা রে গা মা করে গলা সাধে তখন তো পাড়ার কাকগুলো চিল্লামিল্লি লাগিয়ে দেয়। তার ওপর দেমাক কম নাকি? আমার তিনটে মেয়ে তো ওদেরই প্রায় সমবয়সী, আগে বেশ যাতায়াতও ছিল। মিশতে চাস, না বলে দিলেই পারিস। তা না বলে সোনার হার চুরির মিথ্যে অপবাদ দিয়ে আমার মেয়ে তিনটের যাতায়াত বন্ধ করে দিল। ওরাও ছাড়বার পাত্রী নয়, রোজ গলা তুলে ভাল মন্দ শুনিয়ে দেয়। ওই যে দেখুন না মনোর বাড়ির যে জানলাগুলো আমার বাড়িমুখো সেগুলো সব কটকটে করে বন্ধ করে রেখেছে।

তাই তো বটে! তবে যাই বলুন, আপনার উলটো দিকের বাড়িতে যে রাইমোহনবাবু থাকেন এটা একটা সৌভাগ্যেরই ব্যাপার। কত বড় পণ্ডিত মানুষ। ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। তার ওপর বিলেত আমেরিকাতেও নাকি লেকচার দিতে যান। এরকম প্রতিবেশী পাওয়া কি ভাগ্যের কথা নয়! গৌরবেরও তো ব্যাপার।

আপনার দোষ কি জানেন হরিদাসবাবু? আপনি বড় গুজবে বিশ্বাস করেন।

তাহলে কি রাইমোহনবাবু তেমন সুবিধের লোক নন?

দু'পাতা ইংরিজি পড়লেই কি আর মানুষ বদলে যায় হরিদাসবাবু? তাছাড়া রাইমোহনের সাবজেক্ট হলো ফিলজফি। আপনি বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, ওটা একটা সাবজেক্ট? আজকাল ফিলজফির কোনও দাম আছে? আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো ফিলজফি শুনলে ব্যঙ্গের হাসি হাসে, ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। আমি তো শুনেছি, ক্লাসে ছাত্রছাত্রী হয় না বলে রাইমোহন ফাঁকা ক্লাসে গিয়ে বসে বসে ঘুমোয়। আর বিলেত-আমেরিকা! আপনি কি ভেবেছেন ওকে কেউ খরচ করে নিয়ে যায়? না মশাই না ওর এক দাদা বোধহয় বিলেতে ফিটার মিস্ত্রির

কাজ করে!

ফিটার মিস্ত্রি! আমরা যে শুনেছি, মস্ত ইঞ্জিনিয়ার!

ওই তো আপনারা দোষ যা শোনেন তাই বিশ্বাস করেন। ওরকম বলতে হয়। আমি ভালই জানি, কালিঝুলি মেখে যন্ত্রপাতি সারায়। তা সেই দাদাই একে ওকে ধরে প্যাসেজ মানি যোগাড় করে পাঠায়। বক্তৃতা দিতে যায় না হাতি। এসে ওসব গল্প মারে আর কি!

কিন্তু এই যে শুনি, রাইমোহনবাবু আমেরিকা থেকে একটা ডক্টরেটও পেয়েছেন!

আমেরিকা থেকে ডাকযোগেও ডক্টরেট ডিগ্রি আনা যায় বুঝলেন! তার কোনও দাম নেই। ওসব ডক্টরেট সার্টিফিকেটের দাম ঠোঙার কাগজের চেয়ে বেশি নয়।

রাইমোহনবাবুর মতো নিরীহ মানুষও এসব করেন নাকি?

নিরীহ! কিসে ওকে নিরীহ বলে মনে হলো আপনার? আগে তো আমার সঙ্গে রাইমোহনের বেশ ভাবই ছিল। রোজই সকালের দিকে। ওর বাড়িতে গিয়ে চা চিঁড়েভাজা খেতাম। গল্পগুজবও হতো। তখন তো আর স্বরূপ বুঝতে পারিনি। একদিন যেতেই রাইমোহন ফুঁসে উঠে বলল, আপনি আমার নামে লোকের কাছে যা তা বলে বেড়ান, নিন্দেমন্দ করেন। আমি তো অবাক।

বলতেন নাকি?

আমি হলাম সত্যের পূজারী। যদি বলেও থাকি তাহলে দুটো চারটে সত্যি কথাই বলছি। সেটা কি দোষের?

না না, দোষের হবে কেন? তারপর কী হলো?

দু'চার কথায় হওয়া গরম হয়ে উঠল। রাইমোহনের বউ আর ছেলেমেয়েরাও সব জোট বেঁধে এল। তুমুল চেঁচামেচি কত বড় স্পর্ধা শুনবেন। রাইমোহন আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিতে দিতে বাড়ি থেকে বের করে দিল।

বলেন কি?

তাই তো বলছি। নিরীহ বলে তকমা লাগালেই তো হবে না। সব মানুষের ভেতরেই জন্তু-জানোয়ার থাকে।

আজ্ঞে, সেটা খুব বুঝতে পারছি। রাইমোহনবাবুকে আমি ভাল লোক বলে জানতাম।

আরও ভাল করে জানুন তাহলেই দেখবেন ভালোর খোসা ছাড়িয়ে আসল রূপটা বেরিয়ে পড়বে। সেই ঝগড়ার পর আমার ছোটো ছেলেটার হাত ফসকে একটা ঢিল গিয়ে রাইমোহনের বাড়ির একটা কাচ ভেঙে দেয়। তার জন্য কেউ থানা-পুলিশ করে, বলুন তো।

ছেলেটা তখন খুব ছোট ছিল বুঝি?

ছোটোই, বছর কুড়ি বয়স হতে পারে বড় জোর।

মোটে একটাই ঢিল মেরেছিল বলে উনি পুলিশ ডাকলেন?

ব্যাটাছেলেদের কি আর অত হিসেব থাকে? একটার জায়গায় দুটো বা তিনটেও হতে পারে। ওরা পুলিশকে কী বলেছিল জানেন? বলেছিল আমরা সবাই নাকি ইট পাটকেল জোগাড় করে রাতের অন্ধকারে ওদের বাড়িতে হামলা করি। আর পড়া প্রতিবেশীদের কথা বলছিলেন না? তারা সবাই আমার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে সাক্ষী দিয়েছিল। কত বড় অন্যায় বলুন।

অন্যায়ই তো, তাতে কী হলো?

দেখুন, যে যাই বলুক আর করুক আমি সর্বদা ন্যায় আর সত্যের পথ ধরে চলি। পুলিশ আমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারল যে, তারা ভুল করেছে। তাই ক্ষমা চেয়ে ছেড়ে দিল।

হ্যাঁ আমি জানি। তখন ওই থানার ওসি ছিল আমার শালা। আমার শালাও বলে ফটিকবাবুর মতো লোক হয় না। আপনি নাকি পুলিশকে মিষ্টি খাওয়ার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, খুশি হয়েই দিয়েছিলাম। দেখলাম আমাকে অ্যারেস্ট করে ওরা খুবই অনুতপ্ত। সবাই মন খারাপ করে বসে আছে। তাই বললাম একটা ভুল না হয় করেই ফেলেছো, তাতে কি? এই নাও, সবাই মিষ্টি খাও।

তাতে পুলিশের মুখে হাসি ফুটল বুঝি?

হ্যাঁ, একেবারে গোলাপ ফুলের মতো ফুটে উঠল।

আপনি সত্যিই খুব ন্যায়নিষ্ঠ লোক দেখছি।

সত্য আর ন্যায়ের দীপ্তি আজকাল লোকে সইতে পারে না। বুঝলেন! আর সে জন্যই কেউ এখন আমার কাছে আসে না। কথা কইলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। লোকে বলে আমি নাকি একঘরে। আসলে তো তা নয়, আমার নীতি হলো ওই যে কি বলে, একলা চলো রে!

অতি সত্যি কথা মশাই, অতি সত্যি কথা, আপনার দীপ্তিতে আমারও চোখ ঝলসে যাচ্ছে। আচ্ছা আসি তাহলে। নমস্কার।

দিনকাল

বিলাস গরু চরাতে হক সাহেবের মাঠে এসেছে। কোঁচড়ে মুড়ি, এক হাতে বাঁশি, অন্য হাতে রিমোট কন্ট্রোল। গরুদের প্রত্যেকটির কানের কাছে একটি করে রিসিভার যন্ত্র আছে। পাচনবাড়ির দরকার হয় না, রিমোটের বোতাম টিপেই ব্যাদড়া গরুকে বশে রাখা যায়।

হক সাহেবের মাঠটি চমৎকার।। সবুজ দেড় বিঘৎ লম্বা পুষ্টিকর ঘাসে ছাওয়া। একসময়ে অবশ্য ন্যাড়া বালিয়াড়ি ছিল। প্রায় দুশো বছর আগে অর্থাৎ বাইশ শো তেষট্টি সালে অজিত কুণ্ডু নামে এক বৈজ্ঞানিক তাঁর বিখ্যাত যান্ত্রিক ইঁদুর আবিষ্কার করলেন। ছোটো ছোটো যন্ত্রের ইঁদুর মাটিতে গর্ত করে দশ পনেরো বিশ মিটার নিচে নেমে যায় আর সেখান থেকে মাটি তুলে এনে ওপরে ছড়িয়ে দেয়। এইভাবে বালিয়াড়ি, সাহারা বা কালাহারির মতো মরুভূমি সব অদৃশ্য হয়ে এখন উর্বর মাটি, শস্যক্ষেত্র আর বনে জঙ্গলে সেসব জায়গা ভরে গেছে। মাটিকে উর্বর আর সরস রাখতে কেঁচো ও জীবাণুদের কাজে লাগানো হয়েছে। ফলটা হয়েছে চমৎকার। হক সাহেবের মাঠটি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

পাশেই রামরতন ঘোষের মস্ত বড় ক্ষেত। ক্ষেতের পাশে একটা বেলুন চেয়ারে বসে রামরতন তার রিমোট কন্ট্রোলে ক্ষেতে ধান রুইছে। রামরতনের রোবট যন্ত্রটি দেখতে অবিকল একট বাচ্চা মেয়ের মতো প্রোগ্রাম করে দেওয়া আছে। যন্ত্র-বালিকা ঠিকমতোই ধান রুইবে। তবে রামরতনের যন্ত্র-বালিকাটির দোষ হলো, চোখের আড়াল হলেই খানিকটা এক্কা দোক্কা খেলে নেয়। হয়তো আগে অন্যরকম পোগ্রাম করা ছিল, সেটা পুরোপুরি তুলে না দিয়েই নতুন পোগ্রাম বসিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এজন্য রামরতনের একটু ঝামেলা হচ্ছে।

বিলাস তার নাইলনের ব্যাগ থেকে চোপসানো একটা বেলুনের মতো জিনিস বের করল। একটা খুদে সিলিন্ডারের নজ্‌ল্‌ বেলুনের মুখে চেপে ধরতেই লহমায় বেলুনটা ফুলে একটা ভারী সুন্দর আরামের চেয়ারে পরিণত হলো। বিলাস চেয়ারে বসে কোঁচড় থেকে মুড়ি খেতে খেতে হাঁক মারল, ও রামরতনদাদা, বলি করছোটা কি?

রামরতন তার দিকে চেয়ে বিরক্ত মুখে বলল, চার একর জমিতে ধান রুইতে বড় জোর আধঘণ্টা লাগাবার কথা। আর ওই বিচ্ছু মেয়ে ঝাড়া দু ঘণ্টায় এক একরও পারেনি।

বিলাস তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দাও না। যন্তর তো তোমারই হাতেই রয়েছে।

রামরতন বিরক্ত হয়ে বলে, তাহলে তো কথাই ছিল না। এঁর তো গুণের শেষ নেই। যেই স্পিড বাড়াবো অমনি ফাঁক ফাঁক করে বুনতে শুরু করবে। তাতে কাজ বাড়বে বই কমবে না।

যন্তরটা তাহলে তোমাকে খারাপই দিয়েছে। বদল করে নাও না কেন?

রামরতন এবার তার চেয়ারে লাগানো নম্বরের প্লেটে একটা নম্বর টিপল। তার চেয়ারটা সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে উঠে ভাসতে ভাসতে বিলাসের চেয়ারের পাশে

এসে নামল। রামরতন টিসু কাগজে মুখ মুছে বলে, সে চেষ্টা কি আর করিনি নাকি? ও মেয়েকে তুমি চেনো না। যন্ত্র-বালিকা হলে কি হয়, মাথায় খুব বুদ্ধি। চার মাস হলো কিনেছি গুচ্ছের টাকা দিয়ে, দু বছরের গ্যারান্টি আছে। কাজে দোষ হলে বদলে দেবে বা টাকা ফেরৎ দেবে। কিন্তু এ মেয়েটা বাড়িতে ঢুকেই আমাকে বাবা বলে, আর আমার গিন্নীকে মা বলে ডাকতে শুরু করেছে। চালাকিটা দেখেছ? এখন আমার গিন্নীর এত মায়া পড়ে গেছে যে মৃগনয়নীকে ফেরৎ দেওয়ার কথা শুনলেই খেপে ওঠেন।

মৃগনয়নী কি ওর নাম?

আমার গিন্নীর দেওয়া। মেয়েটাকে নিয়ে জেরবার হচ্ছি। ওই দেখ, আবার খেলতে লেগেছে।

বাস্তবিকই মৃগনয়নী ধান রোয়া ফেলে একটা স্কিপিং দড়িতে তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছিল। মুখে হাসি।

রামরতন রিমোটটা তুলে ধরে বোতাম টিপে মেয়েটাকে ফের কাজে লাগিয়ে দিয়ে বলল, সারাক্ষণ এই করতে হচ্ছে। সকালে পান্তাভাত খেয়ে এসেছি, কোথায় একটু ঝিম মেরে চোখটি বুজে থাকব, তার উপায় নেই।

ফেরৎ না দাও, রিপ্রোগ্রামিং করিয়ে নিলেই তো পারো। ওরা ডিস্কটা ভাল করে পুঁছে আবার প্রোগ্রাম করে দেবে।

রামরতন বিমর্ষ মুখে বলে, সে চেষ্টাও কি আর করিনি? গিন্নী তো করতে দিচ্ছে না। বলে, ও যে দুষ্টুমি করে, খেলে তাতেই আমার বেশি ভাল লাগে। এ সময়টায় একটু ভাত-ঘুম ঘুমিয়ে না নিলে আমার শরীরটা বড় ম্যাজম্যাজ করে।

রামরতন গোটা দুই হাই তুলল, দেখে বিলাস সমবেদনার সঙ্গে বলল, একটা হর্ষ-বড়ি খেয়ে নেবে নাকি? তাহলে বেশ চাঙ্গা লাগবে। আমার কাছে আছে।

রামরতন মাথা নেড়ে বলে, না রে ভাই। সেদিন একটা খেয়ে যা অবস্থা হলো, আনন্দের চোটে এমন নাচানাচি, লাফালাফি, চেঁচামেচি, করেছি যে পরে গা-গতরে ব্যথা হয়ে গলা ভেঙে কাহিল অবস্থা।

মুড়ি চিবোতে চিবোতে বিলাস বলে, তা তোমার তো প্লাস্টিকের হার্ট, তুমি কাহিল হয়ে পড়ো কেন? প্লাস্টিকের হার্টওলা লোকেরা নাকি সহজে কাহিল হয় না।

সে কথা ঠিক। তবে আমার কপালটাই তো ওরকম। যে হার্টটা বসানো হয়েছে সেটা নাকি বাঙালীদের ধাত অনুযায়ী টিউন করা নয়, তখন বাঙালী হার্টের সাপ্লাই ছিল না বলে আমাকে একটা জার্মান হার্ট লাগিয়ে দিয়েছে, সেটা একটু বেশি শক্তিশালী। ফলে আমার শরীরের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। মাস তিনেক বাদে বাঙালী হার্ট এলে এটা বদলে দেবে বলেছে।

দুজনে কথা হচ্ছে এমন সময়ে হঠাৎ আকাশে একটা গোলগোল মেঘ দেখা দিল, আর ছ্যাড় ছ্যাড় করে বৃষ্টি হতে লাগল।

বিলাস চমকে উঠে বলে, আরে! বৃষ্টি হচ্ছে কেন? এখন তো বৃষ্টি হওয়ার কথা নয়! দেখ তো মুড়িগুলো ভিজে গেল!

আমারও আবার সর্দির ধাত। বলে রামরতন হাতের রিমোটটা উল্টে নম্বর ডায়াল করতে লাগল। রিমোটার উল্টো পিঠটা টেলিফোনের কাজ করে। রামরতন বলল, হাওয়া অফিস? তা ও মশাই, হক সাহেবের মাঠে এখন বৃষ্টি হওয়াচ্ছেন কেন? আমরা তো বৃষ্টি চাইনি।

হাওয়া অফিস খুব লজ্জিত হয়ে বলে, এঃ হেঃ সরি, একটু ভুল হয়ে গেছে। আসলে ওটা হওয়ার কথা সাহাগঞ্জের মাঠে। ঠিক আছে আমরা মেঘটাকে সরিয়ে দিচ্ছি।

মেঘটা হঠাৎ একটা চক্কর খেয়ে ভোঁ করে মিলিয়ে গেল। আবার রোদ দেখা দিল।

বিলাস ক্ষুব্ধ গলায় বলে, হাওয়া অফিসটা আর মানুষ হলো না। সব সময়ে ক্যালকুলেশনে ভুল করে যা নয় তাই ঘটিয়ে দিচ্ছে। এ হলো ফিনল্যান্ডের বাবু-মুড়ি, জল লাগলেই গলে যায়।

ওই তো কত ফিরিওলা চরে বেড়াচ্ছে। একটাকে ডেকে মুড়ি কিনে নে না। বাস্তবিকই আকাশে ইতস্তত কয়েকটা বাটির মতো আকারের জিনিস শ্লথগতিতে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের তলায় কোনোটায় লেখা জলখাবার, কোনোটায় লেখা প্রসাধন সামগ্রী, কোনোটায় লেখা বৈদ্যুতিক সামগ্রী মেরামত ইত্যাদি। বিলাস বাঁশিটা মুখে নিয়ে বাঁশির গায়ে একটা বোতাম টিপে ফুঁ দিল। কোনো শব্দ হলো না। কিন্তু আকাশ থেকে একখানা বাটি নেমে এসে তার সামনে থামল। বাটিতে মেলা খাবার জিনিস সাজানো। দোকানী একজন বুড়ো মানুষ। বলল, কী চাই?

ফিনল্যান্ডের বাবু-মুড়ি আছে নাকি?

ফিনল্যান্ডের মুড়ি আবার মুড়ি নাকি? যন্তরে মুড়ি আছে, একবার খেলে জীবনে আর স্বাদ ভুলতে পারবে না। নাম হলো উড়ুক্কু মুড়ি।

আজকাল নিত্যি নতুন জিনিস বেরোচ্ছে। উড়ুক্কু মুড়ি বিলাস খায়নি। নিল এক প্যাকেট। দাম নিয়ে বুড়ো বাটি সমেত ফের আকাশে উঠে গেল। বিলাস একমুঠো মুখে দিয়ে দেখল, চমৎকার, চিবোতে না চিবোতেই যেন মুখে মিলিয়ে যায়। স্বাদটাও ভাল।

ওরে ও বিলাস, তোর কেলে গরু যে আমার ক্ষেতে ঢুকে যাচ্ছে, এখনই সব তছনছ করবে। ওটি সাঙ্ঘাতিক দুষ্টু গাই।

বিলাস তাড়াতাড়ি রিমোট তুলে বোতাম টিপতেই কেলে গরুটা থমকে একটু শিং নাড়া দিল। তারপর সুড়সুড় করে আবার ফিরে এসে ঘাস খেতে লাগল। বিলাস বলল, রামরতনদা, তোমার রিমোটটা আমাকে দিয়ে তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি মৃগনয়নীকে সামলে রাখব'খন।

বাঁচালি ভাই, এই নে, বলে রিমোটটা বিলাসকে দিয়ে রামরতন সবে চোখ বুজেছে এমন সময় হঠাৎ মৃগনয়নী কাজ ফেলে দুড়দাড় করে দৌড়ে এল।

ও বাবা!

রামরতন বিরক্ত হয়ে চোখ খুলে বলল, কী বলছিস?

ভূতে ঢেলা মারছে যে!

অ্যাঁ!

এই অ্যাত বড় বড় ঢেলা। এই দেখ। বলে মৃগনয়নী একটা ঢেলা হাতের মুঠো খুলে দেখাল।

আর এই সময়েই আরও দু চারটে ঢেলা ওদিককার ক্ষেত থেকে উড়ে এসে আশেপাশে পড়ল। ব্যাপারটা নতুন নয়, আগেও দু'চারবার হয়েছে। রামরতন শুকনো মুখে বিলাসের দিকে চেয়ে বলে, কি করি বল তো!

বিলাস বলল, কার ভূত?

তা কি করে বলব?

দাঁড়াও, থিওসফিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ফোন করে জেনে নিচ্ছি।

বিলাস ডায়াল করে জিজ্ঞেস করল, ও মশাই, হক সাহেবের মাঠে কার ভূত দৌরাত্ম্য করছে তা জানেন?

ও হলো ষষ্ঠীচরণ সাহার ভূত। ওকে চটাবেন না।

কিছু একটা করুন। ক্ষেতের কাজ যে বন্ধ হওয়ার যোগাড়।

সে আমাদের কম্ম নয়। ভূতের সঙ্গে কে এঁটে উঠবে?

তাহলে?

চোখ কান বুজে সয়ে নিন। কিছু করার নেই।

বিলাস ফোন বন্ধ করে বলে, ষষ্ঠী খুড়োর ভূত। কেউ কিছু করতে পারবে না।

রামরতন একটু খিঁচিয়ে উঠে মৃগনয়নীকে বলে, তোর এত আদিখ্যেতা কিসের? ঢেলা পড়ছে তো পড়ুক না। তোর তো আর ব্যথা লাগবার কথা নয়!

মৃগনয়নীর চোখ ভরে জল এল। ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, না, লাগেনি বুঝি! এই দেখ না কনুইয়ের কাছটা কেমন ফুলে আছে।

সত্যিই জায়গাটা ফোলা দেখে রামরতনের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। বিলাসের দিকে চেয়ে বলল, এ কী রে? রোবটেরও যে ব্যথা লাগছে আজকাল।

বিলাস বলল, শুধু কি তাই? চোখে জল, ঠোঁটে অভিমান, নাঃ, দিনকাল যে কী রকম পড়ল!

রামরতন মৃগনয়নীকে বকবে বলে বড় বড় চোখ করে ধমকাতে যাচ্ছিল, মৃগনয়নী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না কেন্ন বাবা?

রামরতনের রাগ জল হয়ে গেল। ঠিক বটে, সে মানুষ আর মৃগনয়নী নিতান্তই যন্ত্র-বালিকা। কিন্তু সবসময়ে কি আর ওসব খেয়াল থাকে? রামরতন হাত বাড়িয়ে মৃগনয়নীকে কাছে টেনে এনে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, কাঁদিসনে মা, আজ তোকে খুব সুন্দর একটা ডলপুতুল কিনে দেবো।

বিলাস মুখটা ফিরিয়ে একটু হাসল।

সময় সরণী

আচ্ছা, এটা কি সুধীরবাবুর বাড়ি?

হ্যাঁ, আমিই সুধীর ভট্টাচার্য। আপনি কে বলুন তো?

আমাকে ঠিক চিনবেন না। বিশেষ প্রয়োজনে আসা। ভিতরে আসতে পারি কি?

আসুন।

এখানে বোধহয় দরজার বাইরে চটি ছেড়ে ঢোকার নিয়ম, তাই না?

তা নিয়ম একটা আছে বটে, যদি আপনার অসুবিধে না হয়, তাহলে—

না, না, ঠিক আছে। চটি ছেড়েই আসছি।

আসুন, বসুন।

আপনাদের এ জায়গাটা বেশ গরম।

তা তো বটেই। গ্রীষ্মকালে এ দেশে গরম পড়ে। আপনি কি এ দেশে থাকেন না?

না, না, আমিও এ দেশেই থাকি। মাত্র কয়েক মাইল তফাতে। তবে আমাদের ওখানে বিশেষ গরম নেই।

কয়েক মাইলের তফাতে তো আর দার্জিলিং পাহাড় নয় মশাই।

না, না, অত দূরের কথা বলছি না। আমি শ্যামবাজারের দিকটায় থাকি।

তা শ্যামবাজারে গরমের অভাব কি? কালও তো হাতিবাগানে গিয়ে গলদঘর্ম হয়েছি। আপনি বোধহয় এয়ার কন্ডিশনে থাকেন।

খানিকটা তাই।

তাই বলুন।

তবে সেটা ন্যাচারাল এয়ার কন্ডিশনিং।

সেটা আমার কিরকম?

এমন সব গাছ আছে যা কুলিং সিস্টেমের কাজ করে।

গাছ! শ্যামবাজারে আবার গাছ কোথায় পেলেন?

সে কথা থাক। আগে জরুরি কথাটা সেরে নিই।

হ্যাঁ বলুন।

এখন ঘড়িতে বাজছে সকাল ন'টা। ঠিক তো!

হ্যাঁ। কাঁটায় কাঁটায়।

ঠিক দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে এ বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটবে। আর সেইজন্যই

আমার আসা।

ঘটনা! কী ঘটনা বলুন তো! দিনে-দুপুরে ডাকাত পড়বে নাকি?

না, না। অত বড় ঘটনা নয়। খুবই তুচ্ছ একটা ঘটনা, কিন্তু তার তাৎপর্য গভীর।

আপনি কি জ্যোতিষী?

আজ্ঞে না। তবে আজি লজিক্যাল।

তার মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে? আপনি কী পাগল?

দাঁড়ান, আমার কথাগুলো একটু হেঁয়ালির মতো হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। আসলে এখনকার বাংলা ভাষায় কথা বলতে তেমন অভ্যস্ত নই তো, তাই।

আপনি কি বাঙালি নন?

বাঙালিই, তবে একটু অন্যরকম বাঙালি। আমাদের বাংলাটা একটু অন্যরকম।

তা হতেই পারে। শুনেছি চট্টগ্রাম বা সিলেটের বাংলা বেশ অন্যরকম।

প্রবলেমটা অনেকটা সেরকমই। যাই হোক, একটু বুঝিয়ে বলছি।

বলুন।

আপনার ছেলের নাম কিংশুক ভট্টাচার্য তো?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তাকে চিনলেন কী করে?

তিনি আমার দাদু।

দাদু! বলেন কি মশাই! আপনার মাথায় তো বেশ গণ্ডগোল! আমার ছেলের বয়স মাত্র আট মাস। আর কিংশুক নামটাই যে শেষ অবধি রাখা হবে তারও ঠিক নেই।

প্লীজ দয়া করে ওঁর নাম কিংশুকই রাখবেন। দু' হাজার বাষট্টি সালে কিংশুক ভট্টাচার্য নামেই উনি 'নোবেল প্রাইজ পাবেন। নাম পাল্টালে অনেক গণ্ডগোল হয়ে যাবে।

আচ্ছা মশাই, আপনি এখন আসুন। আমার অনেক কাজ আছে।

ভয় পাবেন না, আমি পাগল নই। আমি সত্যিই কিংশুক ভট্টাচার্যের নাতি। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেই বুঝতে পারবেন।

আপনি কি টাইম মেশিনের গপ্পো ফাঁদবেন? ভবিষ্যৎ থেকে উড়ে এসেছেন। ওসব গুলগল্প আমাদের ঢের জানা আছে। আমরা ঘনাদার গল্প অনেক পড়েছি। স্টিফেন হকিং বলেই দিয়েছেন টাইম ট্রাভেল সম্ভব নয়। মিচকি মিচকি হাসছেন যে!

স্টিফেন হকিং তো আর সব সত্যের সন্ধান জানতেন না, অধিকাংশ সত্যই হলো আপেক্ষিক। এক এক দেশে এক এক সময়ে এক এক পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে এক একটা জিনিসকে সত্য বলে প্রতীয়মান হয় মাত্র। আমি সত্যিই সময়ের সরণী বেয়ে এসেছি। আমি সম্পর্কে আপনার ছেলে কিংশুকের নাতি, আপনার পুতি।

হাঃ হাঃ মশাই, বেড়ে গল্প ফেঁদেছেন। আসল কথাটা কী বলুন তো!

সেই কথা বলতেই আসা। নইলে আমরা সহজে টাইম ট্রাভেল করি না, তাতে অনেক রকম বিপত্তি হয়। যা বলছি দয়া করে শুনুন। বেলা দশটা কুড়ি মিনিট নাগাদ আপনার বন্ধু বঙ্কুবিহারী আর অরূপ মাইতি আসবেন। দশটা পঁচিশ মিনিট নাগাদ আপনার স্ত্রী তাঁদের দুজনকে দুটি করে সিঙ্গাড়া পরিবেশন করবেন। সিঙ্গাড়াগুলো আপনি গতকালই একটি মাড়োয়ারি দোকান থেকে কিনে এনেছেন, কিন্তু অত্যধিক ঝাল বলে খেতে পারেননি, ফ্রিজে রেখে দেওয়া আছে। আপনার

স্ত্রী সেগুলোই মাইক্রো ওয়েভে গরম করে দেবেন। দশটা বত্রিশ নাগাদ অরূপ ও বঙ্কুবিহারী ঝালে হাঁসফাঁস করতে করতে ঠাণ্ডা জল চাইবেন। আপনার স্ত্রী ফ্রিজের জল নিয়ে এ ঘরে আসবার উপক্রম করবেন। আর তখনই ঘটনাটা ঘটবে। আপনি ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন?

একটু অবাক হচ্ছি। সিঙ্গাড়ার ঘটনাটা সত্যি। বাকিগুলো সত্যি কিনা—

সত্যি। একটু বাদেই বুঝবেন।

আচ্ছা বেশ। কিন্তু ঘটনাটা কী?

আপনার স্ত্রী হাত থেকে একটা কাচের গেলাস পড়ে গিয়ে ভাঙবে এবং গেলাসের জল পড়ে পিছল মেঝেতে আপনার স্ত্রী আছাড় খেয়ে পড়ে ফিমার বোন ভাঙবে।

সর্বনাশ।

আরও সর্বনাশ হলো ফিমার বোন ভেঙে আপনার স্ত্রী শেষ অবধি পঙ্গু হয়ে যাবেন এবং তার ফলে চিনাংশুক জন্মাতে পারবে না।

চিনাংশুক! সে কে?

কিংশুকের ছোটো ভাই।

বলেন কি?

যা বলছি দয়া করে শুনুন। চিনাংশুক না জন্মালে খুবই গণ্ডগোল হয়ে যাবে।

দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান। আপনি নিজে তো পাগল বটেই, কিন্তু আপনার পাগলামির চোটে যে আমারও পাগল হওয়ার যোগাড়! কী সব আবোল-তাবোল বকছেন? রেগে যাবেন না, মাথা ঠাণ্ডা করুন। সমস্যাটা অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

সমস্যাটা কী?

সমস্যা হচ্ছে এক গেলাস জল। ওই এক গেলাস জলই ভাবী কালের ইতিহাস পাল্টে দিতে পারে। আর সেইজন্যই আমার আসা।

আপনার গুলগপ্পে আমি বিশ্বাস করি না। আপনি আসুন এখন।

আপনার যাতে বিশ্বাস হয় সেইজন্য দু'হাজার বাষট্টি সালের একটি খবরের কাগজ আমি সঙ্গে করেই এনেছি। এটি অবশ্য আপনাদের সংবাদপত্রের মতো নিউজপ্রিন্টে ছাপা নয়, এটি ছাপা হয়েছে সিনথেটিক পেপারে। এই যে ফ্রন্ট পেজে বড় হেডিং-এ খবরটা দেখুন।

ও বাবা! এ তো দেখছি কিংশুক ভট্টাচার্য পদার্থবিদ্যায় সত্যিই নোবেল প্রাইজ পেয়েছে! এটা জালি ব্যাপার নয় তো?

ওই খবরের কাগজটা যে মেটেরিয়ালে ছাপা হয়েছে তা আপনি কখনও দেখেছেন?

না মশাই! এ তো ভারী নরম অথচ মোলায়েম জিনিস। আর ছাপাও তো দারুণ সুন্দর। কিন্তু ভাষাটা একটু যেন কেমন কেমন। সব বাক্য ভাল বোঝা যাচ্ছে না।

ভাষা নিরন্তর পরিবর্তনশীল জিনিস। আমাদের আমলে ভাষা অনেক সংকেতময় হয়েছে।

তাই দেখছি।

এখন কি একটু একটু বিশ্বাস হচ্ছে?

আমি ধাঁধায় পড়ে গেছি। তা আপনি যদি টাইম ট্রাভেলার হয়েই থাকেন তাহলে আপনার গাড়ি কই?

টাইম ট্রাভেল করতে গাড়ি লাগে নাকি?

সিনেমায়-টিনেমায় তাই তো দেখি।

ও তো আজগুবি ব্যাপার। তবে গাড়ি না হলেও একটা শ্যাফ্‌ট বা লম্বা নলের মতো জিনিস আছে। ওর টেকনোলজি আপনি ঠিক বুঝবেন না। তবে শ্যাফ্‌টটাও

আপনার বাড়ির সামনের ওই খেলার মাঠটায় রয়েছে। ওটা দেখতে পাবেন না, কারণ ওটা ওখানে রয়েছে রাত তিনটের স্লটে। দিনে-দুপুরে শ্যাফ্‌টটা দেখতে পেলে লোকের অনাবশ্যক কৌতূহল হবে।

যাক গে, এখন খোলসা করে বলুন ব্যাপারটা কী।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে হলো, সময়ের শরীরে মাঝে মাঝে এক-আধটা কুঞ্চন দেখা দেয়। ওই কুঞ্চনের ফলে অনেক সময়ে পরবর্তী ঘটনাবলীতে প্রভাব পড়ে। আমরা তেমন বিপজ্জনক কুঞ্চন দেখলে সেটাকে একটু মসৃণ করে দিই মাত্র। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কিংশুক ভট্টাচার্য দু'হাজার বাষট্টি সালে যে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পাবেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার স্ত্রীর যদি আজ ফিমার বোন ভাঙে এবং চিনাংশুক না জন্মায় তাহলে কিংশুক ভট্টাচার্য সেই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটা করতে পারবেন না।

কেন মশাই?

তার কারণ কিংশুক একমাত্র সন্তান হলে তাকে আপনারা অত্যধিক আদর দেবেন এবং অতি আদরে সে অলস অপদার্থ এবং বখা হয়ে যাবে। ফলে তার পক্ষে আর আবিষ্কারটা সম্ভব হবে না। চিনাংশুক জন্মালে কিন্তু আপনাদের মনোযোগ সে অনেকটাই কেড়ে নেবে এবং কিংশুক ভট্টাচার্যও অ্যাকটিভ থাকবেন।

বটে! এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার।

হ্যাঁ। কিন্তু দশটা পনেরো বাজে। প্রস্তুত হোন।

কী করতে হবে মশাই?

আপনি কিছুই করবেন না। শুধু আপনার স্ত্রী যখন জলটা আনবেন তখন উঠে গিয়ে আপনি ওঁর হাত থেকে গেলাস দুটো নিয়ে নেবেন। টাইমিংটা কিন্তু খুব জরুরি। এক সেকেন্ড আগে বা পরে হলেই ব্যাপারটা কেঁচে যাবে।

বুঝেছি।

খুব সাবধান। ওই ডোরবেল বাজছে, আপনার বন্ধুরা এসেছেন।

দরজা কি খুলে দেবো?

দিন। আমার নাম অশঙ্ক ভট্টাচার্য। আমাকে আপনার দূরসম্পর্কের আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে পারেন বন্ধুদের কাছে।

তাই হবে। বলে গিয়ে সুধীরবাবু দরজা খুলে দেখলেন সত্যিই বঙ্কু আর অরূপ এসেছে।

তার পরের ঘটনাগুলো ঠিক যেমনটি অশঙ্ক বলেছিল তেমনই ঘটতে লাগল। ঝাল সিঙ্গাড়া খেয়ে দুজনেই বলে উঠল, বউদি, ঠাণ্ডা জল দিন।

অশঙ্ক চোখের ইশারা করে সুধীরবাবুকে বলল, এইবার! খুব সাবধান কিন্তু—

সুধীরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন এবং তাঁর স্ত্রী যখন ফ্রিজের বোতল বের

করে গেলাসে জল ঢালছেন তখনই গিয়ে বললেন, দাও গেলাস দুটো, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

তুমি! তুমি নেবে কেন?

আহা, দাও না। তুমি পড়ে-টড়ে গেলে যে সর্বনাশ!

পড়ব! আমি পড়ব কেন?

পড়ারই কথা কিনা। আর তুমি পড়লে চিনাংশুক জন্মাতে পারবে না। তাহলে যে সর্বনাশ।

বলি সকালেই কি গাঁজা টেনেছো নাকি? কী সব বাজে বকছো! সরো, জল আমি নিয়ে যাচ্ছি।

আহা-হা, করো কি, করো কি!

বলে সুধীরবাবু তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে গেলাস দুটো একরকম কেড়েই নিতে গেলেন। আর টানা-হ্যাঁচড়ায় একটা গেলাস হাত ফসকে পড়ে শতখান হয়ে ভাঙল। এবং স্ত্রী নয়, সুধীরবাবু নিজেই পিছলে দড়াম করে পড়ে গেলেন।

স্ত্রী আর্তনাদ করে উঠলেন। বন্ধুরা ছুটে এল। সঙ্গে অশঙ্কও। ধরাধরি করে তোলা হলো তাঁকে। বাঁ হাতটায় প্রচণ্ড লেগেছে।

বঙ্কু ডাক্তার। হাতটা ভাল করে দেখে বলল, কনুইয়ের কাছটা তো ফ্যাকচার হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। ভোগাবে।

সুধীরবাবুর মুখে অবশ্য হাসি। অশঙ্কের দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললেন, কী হে বাপু, কেমন সামলে দিয়েছি?

অশঙ্ক মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ, সময়ের যে কুঞ্চনটা ছিল সেটা এখন সটান হয়ে গেছে।

আশ্চর্য অলিম্পিক

হাঁদুবাবু বেজায় ক্লান্ত। ক্রমাগত ঢুলুনি আসছে, শরীরটা ভারি ম্যাজম্যাজ করছে, তা ক্লান্তির আর দোষ কী? এবারে দিল্লির অলিম্পিক গেমসের জন্য নতুন রকমের হুকুম হয়েছিল। আকাশের নক্ষত্র দিয়ে পাঁচটি বলয় সাজাতে হবে। কাজ কি সোজা? হাঁদবাবু একটু গাঁইগুঁই করেছিলেন, কিন্তু হুকুম নড়েনি। গত আড়াই বছরের চেষ্টায় প্রায় আড়াই হাজার নক্ষত্রকে টানা-হ্যাঁচড়ায় কক্ষচ্যুত করে নতুন করে সাজাতে হলো, পাঁচটি বলয় আবার ভিন্ন ভিন্ন তো নয়, একটার ভিতর দিয়ে আর একটাকে গলাতে হবে। অনেক হিসেব-নিকেশের ব্যাপার ছিল। অলিম্পিকের আর দেরি নেই বলেই উদ্বোধন অনুষ্ঠান। তবে হাঁদুবাবুর কাজ শেষ হয়েছে। কাজটা উতরেও গেছে চমৎকার। আকাশের দিকে তাকালে যে-কোনো সময়েই পাঁচ-পাঁচটি বলয় দেখা যাবে। হ্যাঁ, এমনকি দিনমানেও। দিনের বেলা যাতে দেখা যায় তার জন্য বিশেষ ট্রিটমেন্টও করতে হয়েছে। আর নক্ষত্র তো আর ছোটখাটো জিনিসটি নয়। সূর্যের চেয়ে হাজারগুণ বড় নক্ষত্রও রয়েছে। সুতরাং হাঁদুবাবু কেন হাঁফসে পড়েছেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তবে মনটা আজ ভারি ভাল লাগছে। এখন বাড়ি ফিরে স্নান করে চারটি খেয়ে টানা ঘুম দেবেন। কাল অলিম্পিক।

ড্রাইভার উদ্ভব ইন্টারকমে বলে উঠব, স্যার, একটু মুশকিল হয়েছে।

হাঁদুবাবু ঢুলতে ঢুলতে বললেন, মুশকিল আবার কিসের?

শর্টকাট ধরে যাচ্ছি, কিন্তু সামনে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়েছে। যন্ত্রপাতি সব উল্টো গাইছে। কী করে হলো তা বুঝতে পারছি না। আসবার সময় এখানে এ-রকম কোনো ব্যাপার তো দেখিনি।

উদ্ধবটা একটা হাঁদা, হাঁদুবাবু জানেন। ওর মগজটাকে রি-সেট করেছেন অনেকবার কিন্তু আই-কিউ বাড়েনি। তবে উদ্ধব পুরনো লোক বলে তাকে বাতিল করেননি হাঁদুবাবু, তাঁর বড় মায়া। কিন্তু এটা ভালই বুঝতে পারছেন, উদ্ধবের মতো রোবটকে দিয়ে তাঁর আর বেশি দিন চলবে না।

বাইরের দিকে চেয়ে হাঁদুবাবু দেখলেন, মহাজগতের যেখানে এখন রয়েছেন তার নাগালের মধ্যে সেই মৃতপ্রায় লাল তারাটি। অর্থাৎ পৃথিবী আর মাত্র ঘণ্টাখানেকের পথ। হাঁদুবাবু তাঁর সামনে প্যানেলের দিকে চেয়ে দেখলেন, চৌম্বক ঝড়ে যন্ত্রপাতি কিছু উল্টোপাল্টা রিডিং দিচ্ছেও।

হাঁদুবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, উদ্ধব একটু মাথা খাটাতে শেখো। আকাশের

অতগুলো নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হয়ে রি-অ্যারেঞ্জড হয়েছে। তার ফলে মহাজগতের ভারসাম্যে বেশ বড় রকমের ধাক্কা লেগেছে। ফলে ম্যাগনেটিক স্টর্ম খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তোমাকে অনেকদিন বলেছি যন্ত্রের ওপর নির্ভর করবে না, বিপদে পড়লে ইনস্টিংক্ট কাজে লাগাবে।

উদ্ধব খুব বিনীতভাবে বলল, যে আজ্ঞে। তবে আমিও যে যন্ত্রই, ইনস্টিংক্ট কোথায় পাব?

হাঁদুবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি যন্ত্র হলেও গবেট যন্ত্র। গত দশ বছরে তোমার চেয়ে লায়েক অনেক রোবট তৈরি হয়েছে যাদের ইনস্টিংক্টও তৈরি করে নিয়েছে তারা আর নিজের চেষ্টাতেই। তোমার কোনো চেষ্টাই নেই। এ-যুগে এত ক্যালাস হলে চলে!

উদ্ধব চুপ করে রইল। ইনস্টিংক্ট না থাক, উদ্ধবের আবার অভিমান আছে। হাঁদুবাবু বকাঝকা করলে সে কথা বন্ধ করে দেয়। কাঁদেও নাকি। তবে উদ্ধবের কান্না হাঁদুবাবু কখনও দেখেননি। তাঁর গিন্নী রাধারানী নাকি দেখেছেন। আর সেই জন্যই উদ্ধবকে বকলে রাধারানী খুশী হন না। আর রাধারানীর জন্যই হাঁদুবাবু অন্য কোনো রোবটকে রকেট চালানোর কাজে নিয়োগ করতে পারেন না। উদ্ধবকে দিয়েই কাজ চালাতে হয়।

নেপচুনে একটু না থামলেই নয়, শচীন হোড় সেখানে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করছে গত বছরটাক যাবৎ। শচীনের সঙ্গে দেখা করা দরকার। এবার অলিম্পিকে অতীতের ক্রীড়াবিদ্‌দের আনানোর একটা চেষ্টা চলছে। কতদূর কী হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। অতীত বলতে পঞ্চাশ-ষাট বছর নয়, এক-দেড় হাজার বছর। আগেকার ক্রীড়াবিদেরা যাতে আসতে পারেন, সেটা শচীন হোড়ের গবেষণার বিষয়। টাইম-মেশিনে অতীত বা ভবিষ্যতে যাতায়াত কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হলো অতীত থেকে সেই যুগের মানুষজনকে ধরে আনা নিয়ে। অনেক সময়ে দেখা যায় সময়ের বেড়া টপকাতে গিয়ে অনেকেই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। শচীনকে বলা হয়েছে এমন ব্যবস্থা করতে যাতে কারও কোনো অসুবিধে না হয়। শচীন খাটছেও খুব।

নেপচুন বেজায় ঠাণ্ডা জায়গা। তবে হাঁদুবাবুকে নামতে হবে না। শচীন থাকে মাটির তলার, অনেক গভীরে, চাপ-তাপ-নিয়ন্ত্রিত গবেষণাগারে যেখানে কৃত্রিম আবহমণ্ডল আছে। তা ছাড়া নেপচুনের উপরিভাগকে তপ্ত ও স্বাভাবিক করে তোলারও চেষ্টা চলছে। হয়ে যাবে কয়েক বছরের মধ্যে।

হাঁদুবাবুর বকুনি খেয়ে উদ্ধব রকেটটা ভালই চালাল। চৌম্বক ক্ষেত্রটা পার হয়ে সাঁ-সাঁ করে সৌরমণ্ডলে ঢুকে পড়ল রকেট।

হাঁদুবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, বেঁধে! বেঁধে! নেপচুনে যে নামতে হবে সে খেয়াল

আছে? কবে যে তোমার অন্যমনস্কতা যাবে!

রকেট নেপচুনে নামল এবং সোজা পাতালে গিয়ে একটা চাতালে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শচীনের ঘরে ঢুকে হাঁদুবাবু একটু থতমত খেলেন। অনেকগুলো লোক বসে আছে। তাদের অনেকের মুখ বেশ চেনা-চেনা ঠেকছে। হাঁদুবাবুকে দেখে শচীন ভারি খুশি হয়ে বলে উঠলেন, আরে এসো এসো হাঁদু! এই যে দেখ, এঁরা সব এসে গেছেন।

এঁরা কারা?

আরে এই তো জেসি ওয়েন্স, একুশ বছর বয়সে পাকড়াই এঁকে। আর ইনি এমিল জেটোপেক, পঁচিশের ছোকরা। এই যে দেখছ জনি ওয়েসমুলার, বাইশ। ইনি হলেন কার্ল লুইস, বাইশ। এই ইনি বেন জনসন, তেইশ। ওই ডালে টমসন—চব্বিশ। এই যে ইনি মার্ক স্পিজ, তেইশ। কুড়ি বছরের ম্যারি ডেয়ারকে তো চেনোই। এই কোণে বুবকা, মোজেস। আর ওই যে কোমানিচি, উইলসা রুডলফ, ওলগা করবুট.....

হাঁদুবাবু বুঝলেন শচীন সফল হয়েছে। খুব খুশি হলেন তিনি।

শচীনবাবু চোখের ইশারায় তাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, একটু সমস্যায় পড়েছি ভাই। এই সব ক্রীড়াবিদ্‌দের আনা হয়েছে দর্শক হিসেবে এবং দ্রষ্টব্য হিসেবেও

বটে। কিন্তু এঁরা বলছেন এঁরাও অংশ নেবেন। কী করি বলো তো.....

হাঁদুবাবু অবাক হয়ে বললেন, তা কী করে হয়! এখনকার অ্যাথলিটরা তো আর.....

শচীনবাবু কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, সেইটেই তো কথা.....

খুব জোরাজুরি করছেন কি ওঁরা?

সাংঘাতিক। কোনও নিষেধই শুনতে রাজি নয়।

অলিম্পিক কমিটিকে জানিয়ে দাও। তারা যা ভাল বুঝবে করবে।

জানিয়েছি। তারা সব মিটিংয়ে বসেছে। কিন্তু কমিটি যদি প্রস্তাব নাকচ করে দেয় তাহলে এঁরা বোধহয় জোট বেঁধে আমাকে পেটাবে।

হাঁদুবাবু সচকিত হয়ে বললেন, ও বাবা! খেলোয়াড়রা বড্ড সাংঘাতিক লোক হয়। মারপিটের মধ্যে আমি নেই ভাই। শরীরগতিকও ভাল নয়, ধকল বড় কম যায়নি। আমি সরে পড়লুম।

বন্ধু হিসেবে তুমি অতি যাচ্ছেতাই।

না ভাই আমি শুনেছি খেলোয়াড়রা মারলে নাকি খুব লাগে।

এই বলে হাঁদুবাবু তাড়াতাড়ি এসে রকেটে উঠে দরজা এঁটে দিলেন। একটু বাদেই টের পেলেন, উদ্ধব হাঁদারাম ফাঁক পেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। মস্তিষ্ক যাদের কম ক্রিয়াশীল তাদেরই ঘুম বেশি হয়। না, উদ্ধবকে দিয়ে আর চলছে না।

উদ্ধবকে ডেকে তুলে রকেট ছাড়তে বললেন হাঁদুবাবু। মাথায় একটু উদ্বেগ লেগে রইল। অলিম্পিকে একটা গোল না বাঁধে। অতীতের ক্রীড়াবিদ্‌দের নিয়ে আসাটা কি ভুল হলো?

বাড়িতে ফিরে হাঁদুবাবু তাঁর স্বয়ংক্রিয় স্নানঘরে ঢুকে গেলেন। যান্ত্রিক সব হাত এসে গায়ে তেল মাখাল, স্নান করাল, দাড়ি কামিয়ে দিল, মাথা টিপে দিল, গা মোছাল, কাপড় পরিয়ে দিল। রাধারানী বাড়ি ছিলেন না, বাজার করতে নিউইয়র্ক গিয়েছিলেন সকালে। দুপুরেই অবশ্য ফিরে আসবেন।

স্নান করে উঠে হাঁদুবাবু হাঁক মারলেন, কই রে টেঁপি, খেতে দে।

যাই বাবা। বলে ফুটফুটে এক যন্ত্রমানবী দৌড়ে এল। চটপট হট বক্স খুলে খাবার সাজিয়ে দিল টেবিলে। শুধু তা-ই নয়, সাধাসধি করে এটা-ওটা-সেটা যাচাই করে খাওয়াল।

হাঁদুবাবু একটু বিশ্রাম নিয়ে দিল্লির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলেন। শুনলেন, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাঁর নক্ষত্র সাজানো দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। নোবেল কমিটিতে তাঁর নাম পেশ হলো বলে।

ঘুম ভাঙল রাধারানীর চেঁচামেচিতে। বিকেলে ঘর ঠিকমতো ঝাঁটপাট হয়নি, জলছড়া দেওয়া হয়নি, ঠাকুরের কাছে সাঁঝের বাতি দেওয়া হয়নি, ধূপ জ্বালানো

হয়নি। টেঁপি নাকি টিভি খুলে একটা সিনেমা দেখছিল।

টেঁপিটাকে নিজের মেয়ের মতোই ভালেবাসেন হাঁদুবাবু। তাড়াতাড়ি উঠে রাধারানীকে বললেন, আহা থাক থাক, বোকো না। ছেলেমানুষ তো।

তোমার আস্কারা পেয়েই তো দিন-দিন উচ্ছন্নে যাচ্ছে। দেখ তো গিয়ে আর-পাঁচটা বাড়িতে। যন্ত্রমানবীরা কেমন সুন্দর সময়ের কাজ সময়ে করে ফেলেছে!

রাত্রিবেলা খেয়েদেয়ে গিন্নির সঙ্গে একটু সাংসারিক কথা বলে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে গেলেন হাঁদুবাবু। সকালেই দিল্লি যেতে হবে। অলিম্পিক বলে কথা!

অলিম্পিকের মার্চ পাস্ট ইত্যাদিতে প্রথম দিনটা ভালয় ভালয় কেটে গেল। অতীতের অ্যাথলিটদেরও মার্চ পাস্টে অংশ নিতে দেওয়া হলো। কিন্তু গণ্ডগোল বাধল দ্বিতীয় দিনেই। আমেরিকার প্রতিযোগী দ্বিতীয়জন মাত্র চার সেকেণ্ডে একশো মিটার দৌড়ে বাজি জিততেই বেন জনসন আর কার্ল লুইস চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ওটা কী হচ্ছে! এক সেকেণ্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময় কমাতে আমাদের কালঘাম ছুটে যেত। চার সেকেণ্ডে একশো মিটার দৌড়ানো যে অসম্ভব।

গোলমাল বাধল আরও পরে। রুশ জাম্পার মেয়াগই ভ্লাদিমদি হাই জাম্পে চোদ্দ ফুট ডিঙিয়ে ফেলল। ভালেরি ব্রুমেল আর সোবার্স ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, এটা কী করে হচ্ছে!

বুবকার জন্য আরও বিস্ময় বাকি ছিল। পোল ভল্টে মার্কিন ভল্টার চল্লিশ ফুট পার হয়ে গেল। জিমনাস্টিকস সাঁতার ওয়েটলিফটিং ইত্যাদিতে ইদানীংকালের ক্রীড়াবিদেরা এমন সব কাণ্ড করতে লাগল যে অতীতের ক্রীড়াবিদেরা মুখ লুকোনোর জায়গা খুঁজতে লাগলেন।

অতীতের ক্রীড়াবিদ্‌রা এসব কাণ্ডকারখানা দেখে খুবই দমে গেলেন। ইদানীংকালের অ্যাথলিটদের কাছে তাঁরা পাত্তাও পেলেন না। বিজয়ী অ্যাথলিটরা যেন পাত্তাই দিল না তাঁদের।

তবে যা-ই হোক, ভালয় ভালয় অলিম্পিক শেষ হয়ে গেল। তেমন কোনও গণ্ডগোল হলো না। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট অতীতের অ্যাথলিটদের খুব আদর করে ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন। গোমড়া মুখে ক্রীড়াবিদেরা এলেন ডিনারে। তাঁদের ধারণা, অপমান করার উদ্দেশ্যেই তাঁদের অতীত থেকে টেনে আনা হয়েছে।

বিশাল ভাসমান কাচের টেবিলে এলাহি খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত। টেবিল বা চেয়ারের পায়া বলে কিছু নেই। সবই ভেসে আছে। চেয়ারগুলো আবার অদ্ভুত। বসলে টেরই পাওয়া যায় না যে কিসের ওপরে লোকে বসে আছে। ভারি সুখানুভূতি হয়। চারদিকে ভারি চমৎকার রোশনাই, চোখে লাগে না, কিন্তু সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়। আর খাওয়ার ঘরে যে মৃদু বাজনা শোনা যাচ্ছে, তাও সম্মোহনকারক

বিটোফেন। কিন্তু পিয়ানো-টিয়ানো বা বেহালা-টেহালা নয়, সম্পুর্ণ অন্য ধরনের কোনও বাদ্যযন্ত্র। তার মিঠে আওয়াজে কান ভরে যায়।

আয়োজন দেখে ক্রীড়াবিদেরা হতচকিত, মুগ্ধ। আই ও সি-র প্রেসিডেন্ট সবাইকে স্বাগত জানিয়ে অতীতের ক্রীড়াবিদ্‌দের নৈপুণ্যের সবিশেষ প্রশংসা করে তাঁদের হাতে এ-যুগের নানা মূল্যবান উপহার তুলে দিলেন। অবশ্য কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি উপহারের মধ্যে ছিল না। কারণ এই সব উপহার অ্যাথলিটদের সঙ্গে অতীতে ফিরে যাবে। এই সব যন্ত্রপাতি অতীতে গেলে বিরাট গণ্ডগোল বেধে যেতে পারে। তাঁদের এমন সব জিনিস দেওয়া হলো যা অতীতে গেলেও ক্ষতি নেই।

যা-ই হোক, অতীতের অ্যাথলিটদের পক্ষ থেকে নেতা নির্বাচন করা হলো জেসি ওয়েন্সকে। ওয়েন্স এই আপ্যায়ন আর আতিথেয়তার জবাব দিতে উঠে বললেন, মানুষ এ-যুগে ক্রীড়াদক্ষতার এমন জায়গায় পৌঁছেছে যা কোনোদিন সম্ভব বলে আমরা ভাবিনি। কোন্ মন্ত্রে মানুষ এমন দক্ষতা অর্জন করল তা একটু জানতে পারলে আমি অতীতে ফিরে গিয়ে সেই কৌশলই অনুশীলন করতাম। আমাদের ক্রীড়ানৈপুণ্যের যে-প্রশংসা এখানে শুনলাম, সেটাকে বিদ্রুপ বলেই ধরে নিচ্ছি।

এ-কথায় এ-যুগের মানুষেরা কেন যেন চুপ করে রইল।

হাঁদুবাবু শচীনের কানে কানে বললেন, এঃ, তুমি বলে দাওনি জেসিদাদাকে! দেখ তো কী সব বলে যাচ্ছেন উনি!

শচীন কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, সুযোগও হয়নি, আর সাহসও পাইনি।

হাঁদুবাবু বললেন, মোটেই তা নয়। তুমি আসলে ওঁদের একটু কড়কেও দিতে চেয়েছিলে।

শচীনবাবু ফিচিক করে হেসে বললেন, চুপ, চুপ, শুনতে পাবে! আসলে কি জানেন, লোকগুলো এমন তেরিয়া হয়ে উঠেছিল, ভাবলুম দিই নামিয়ে, যা হয় হবে।

কাজটা ভাল করোনি। তোমার কপালে দুঃখ আছে।

জেসি ওয়েন্সের বক্তৃতার শেষে ক্ষীণ একটু হাততালি পড়ল। অপ্রস্তুতভাবে আই ও সি-র প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়িয়ে অপ্রতিভ একটু হেসে হাতটাত কচলে বললেন, শ্রদ্ধেয় জেসি ওয়েন্স একটু ভুল করেছেন। হয়তো ভুলটা আমাদেরই। তাঁদের জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল যে, আজকাল অলিম্পিকে কোনো মানুষই অংশ নেয় না।

ঘরে সূচীভেদ্য নীরবতা।

কার্ল লুইস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে ওরা কারা?

প্রেসিডেন্ট রুমালে মুখ মুছে একটু জল খেয়ে গলা পরিষ্কার করে বললেন, আসলে বহুকাল আগে থেকেই মানুষের খেলাধুলোর চর্চায় ভাটা পড়ে যায়। তার কারণ হলো, আড়াই হাজার সাল নাগাদ ক্রীড়াজগতে মানুষ যতটা উন্নতি করা

সম্ভব করে ফেলল। কিন্তু তার পর থেকে আর নতুন কোনো রেকর্ড করা সম্ভব হচ্ছিল না। কত রকম চেষ্টাতেও দৌড়ের সময় কমানো বা লাফের দূরত্ব বাড়ানো গেল না। ফলে ক্রীড়াচর্চায় সেই যে ভাটা পড়ল, সে ভাটা এখনও চলেছে। মানুষ এখনো একটু-আধটু খেলে বটে, তবে নিতান্তই শরীরটা ঠিক রাখার জন্য। তার বেশি কিছু নয়। খেলা নিয়ে মাথা ঘামানোও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কী বলব আপনাদের, একটা সময় এল যখন ফুটবল খেলাতেও কেবলই ড্র হয়। আর টস করে জয়-পরাজয় নির্ধারণ করতে হয়। টেনিসে কেবলই ডিউস হতে থাকে। বোঝা গেল এই অচলাবস্থার নিরসন সহজে হবে না। সঙ্গত কারণেই মানুষ খেলাধুলো ছেড়ে দিল। কিন্তু তাই বলে তো আর অলিম্পিক তুলে দেওয়া যায় না। মানুষের বদলে এখন বিভিন্ন দেশ প্রতিযোগী হিসেবে পাঠায় যন্ত্রমানবদের। এবার অলিম্পিকেও আপনারা তাদেরই দেখেছেন। আপনাদের তাদের সঙ্গে নামতে দেওয়ার ইচ্ছে আমাদের ছিল না। শচীনবাবু আপনাদের ব্যাপারটা খুলে বলে দিলে এই গণ্ডগোলটা হতো না। যা-ই হোক, ওই যন্ত্রমানবদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে হেরে গেলেও আপনারা কিন্তু যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এ-কথা শুনে অতীতের অ্যাথলিটরা খানিকক্ষণ হাঁ করে রইলেন। তারপর সবাই হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন।

সাতপুরার হাট

ভারু ভারী ভাল মানুষ, সাতপুরার হাটে সে সব্জী বিক্রি করে কোনও রকমে সংসার চালায়। তার জোত-জমি বেশি নেই, মাত্র বিঘে তিনেক জমি। সে নিজেই লাঙল দেয়। জমিটুকুতে সব্জী ফলায়, তবে সে কেমিক্যাল সার বা পোকা মারার ওষুধ ব্যবহার করে না। সামান্য গোবর বা পচা সারই তার সম্বল। কেমিক্যাল সার দিলে সব্জীর স্বাদ ভাল হয় না। আর পোকা মারার ওষুধ দিলে যারা কিনবে তাদের অসুখ-বিসুখ বা বিষক্রিয়া হওয়ার ভয় থাকে। ভারু ধর্মভীরু মানুষ, সে ওসব পন্থা নেয় না, ফলে তার মুলো বেগুন পালং কপি বা ধনেপাতা কোনওটাই তেমন ফসফস করে বেড়ে ওঠে না। পোকাও লাগে, ফলে তার সব্জীর চেহারা ভাল নয়। কেমন যেন খেঁকুড়ে মরকুটে, ফয়লাটে চেহারা, তা সেসবই নিজের পুরোনো ভ্যানগাড়িটায় চাপিয়ে সে সাতপুরার হাটে বেচতে আসে। বলতে নেই, তার খদ্দেরও তেমন হয় না। দু'চারটে গরিব খদ্দের কম পয়সায় কিছু কিনে নিয়ে যায় বটে, কিন্তু বেশির ভাগ সব্জীই পড়ে থাকে, অনেকেই বলে, ওহে ভারু, আদ্দিকালের ধারণা নিয়ে বসে থাকলে তো কিছু হবে না, ভাল সার, ভাল পোকার ওষুধ দিয়ে দেখ সব্জীর ফলন হবে, বাজারে পড়তে পারবে না, কিন্তু ভারু তাতে রাজি নয়।

গত তিন-চার সপ্তাহ মোটেই বিক্রিবাটা ভাল হয়নি। গেল হপ্তায় তো সাকুল্যে বিক্রি হয়েছিল বাইশ টাকার সব্জী, এরকম ধারা চললে ভারুকে এরপর বউ বাচ্চা নিয়ে উপোস করতে হবে।

আজও ভারু সকাল সকালই এসে তার সব্জীর পসরা সাজিয়ে বসেছে। চারদিকে মেলা দোকানপাট, বিক্রিও হচ্ছে রমরম করে, শুধু তার কাছেই খদ্দেরের আনাগোনা নেই, তবে শীতের মিঠে রোদে বসে থাকতে ভারুর কিন্তু খারাপ লাগছে না। হাটের দৃশ্য দেখতেও ভারী ভাল।

একজন দাড়িওলা মাঝবয়সী লোক দুটো বড় বড় থলি হাতে সব্জীর দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছে আরও অনেকের মতো, লোকটা বেশ ঢ্যাঙা, চেহারাটা রোগা আর চোঁয়াড়ে মতো, মনে হয় রাগী লোক, পোশাকটাও একটু কেমন যেন, আউল-বাউলদের মতো জোব্বা পরা, দেখে মনে হয় গাঁইয়া লোক নয়।

ভারু দেখল লোকটার কারও সব্জীই পছন্দ হচ্ছে না, মহেশতলার গণেশ অ্যাই বড় বড় দুধ-সাদা ফুলকপি নিয়ে বসেছে, সঙ্গে এক হাত লম্বা রাঙা পুরুষ্টু মুলো, লসলসে পালং, সবুজ ফুটবলের মতো বাঁধাকপি। লোকটা সবই হাতে নিয়ে একটু দেখল তারপর মাথা নেড়ে রেখে দিল, অন্যরা থাবাথাবি করে কিনছে, কিন্তু লোকটার

ভাল লাগল না।

পায়ে পায়ে লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়াতেই ভারু একটু জড়োসড়ো হয়ে গেল। গণেশের সব্জীই যখন পছন্দ হয়নি তখন তার তো কোনও আশাই নেই। লোকটা তার একখানা খেঁকুড়ে কপি তুলে ভ্রু কুঁচকে খুব ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, তারপর পকেট থেকে একখানা ছোটো দেশলাই বাক্সর মতো যন্ত্র বের করে কপিটার গায়ে লাগিয়ে কী যেন পরীক্ষা করল, তারপর বেশ ভারিক্কী গলায় বলল, কত দাম হে?

ভারু দাম কখনও বেশি নেয় না। সে লোভী লোক নয়, সে বিনয়ের সঙ্গে বলল, আজ্ঞে তিন টাকা।

লোকটা তার মুলো পালং বাঁধাকপি লঙ্কা সবই একে একে দেখল, তারপর বলল, তোমার সব সব্জীই আমি কিনে নিচ্ছি হিসেব করে দাম বলো।

অ্যাঁ! বলে ভারু হাঁ করে রইল, বলে কী লোকটা? মাথা খারাপ নয় তো! যাই হোক সে তাড়াতাড়ি হিসেব করে বলল, আজ্ঞে দেড়শ টাকা, সব নিচ্ছেন বলে পাইকারী দরে দিচ্ছি।

লোকটা দরাদরি না করে দাম দিয়ে বলল, একটু কষ্ট করে আমার গাড়িতে তুলে দাও, আর পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি।

ভারু জিব কেটে বলে, ছিঃ ছিঃ মাল গাড়িতে তুলে দেবো, তাতে পয়সা কিসের? ও লাগবে না।

লোকটা গম্ভীর মুখে বলল, তা হয় না, পরিশ্রম করবে আর পারিশ্রমিক নেবে না কেন? এই নাও পঞ্চাশ টাকা।

ভারী লাজুক মুখে ভারু নিল, সব্জী সব বস্তায় ভরে হাটের গা ঘেঁষে দাঁড় করানো একটা ভ্যানগাড়ির মতো গাড়ির পাটাতনে তুলে দিল। দেখল, গাড়িটা আর পাঁচটা ভ্যানগাড়ির মতো নয়, নিচে চাকা দেখা যাচ্ছে না, পুরোটাই ঢাকা, তারপর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল, বাবুটি গাড়ির সামনে একটা গদিওলা সীটে উঠে বসে একটা হাতলে চাপ দিতেই ভুস করে একটা শব্দ হল আর গাড়িটা হঠাৎ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

হাঁ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ভারু। ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি রে বাবা! তবে ভারু চেঁচামেচি করল না, মেলা টাকা এসেছে হাতে। সে তাই হাট থেকে দরকারী জিনিসপত্র কিনে আজ বেলাবেলি বাড়ি ফিরে গেল।

পরের হাটবারে ভারু একটু বেশি জিনিসপত্র নিয়েই হাটে এল, একটু ভয়ে ভয়েই এল। বাবুটি ভূত না মানুষ তা সে বুঝতে পারছে না, তাই একটু ভয়-ভাবনাও হচ্ছে।

দোকান সাজিয়ে বসবার কিছুক্ষণ পরেই সেই বাবুটি এসে হাজির, আবার সেই যন্ত্র দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা, দর জিজ্ঞেস করা।

ভারু এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করল, বাবু যদি অভয় দেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

কী কথা?

আজ্ঞে আপনি আগের দিন ওরকম বাতাসে মিলিয়ে গেলেন কেমন করে? আমার খুব ভয় করেছে।

বাবুটি মৃদু হেসে বলল, ভয় নেই, আমার গাড়িটা বাতাসে মিলিয়ে যায় না, আসলে ওটা অন্য একটা সময়ে চলে যায়।

আজ্ঞে, কথাটা ঠিক মাথায় সেঁধোলো না।

না বুঝলেও ভয় পেও না, ভুতুড়ে ব্যাপার নয় হে।

আর একটা কথা বাবু, আপনি আমার অপুরুষ্টু সব্জী সব কিনে নেন, আর কেউ তো নেয় না।

তোমার সব্জীর ফলন তেমন ভাল নয় বটে, তবে সব্জীগুলোয় কোনও বিষাক্ত জিনিস নেই, আর স্বাদও ভাল।

সব্জীর দাম দাঁড়াল আড়াইশ টাকা। সেইসঙ্গে ফের পঞ্চাশ টাকা মজুরী।

না। কপালটা বোধহয় ফিরছে ভারুর।

সপ্তাহে দুটো হাটবার, রবি আর বৃহস্পতিবার, ভারুর সব্জীর ক্ষেতের প্রায় সব সব্জীই মোট পাঁচটা হাটবারে বিক্রি হয়ে গেল।

পরের হাটবারে লোকটা যখন ফের এসে ভারুর সব সব্জী কিনে নিল তখন ভারু বলল, বাবু আমার বাগানে আর যা সব্জী আছে তাতে তার চারটে হাটবার চলবে, তারপর শেষ হয়ে যাবে।

লোকটা একটু হেসে বলল, ভেবো না, তোমাকে একটা গাছের চারা দিয়ে যাচ্ছি। এ গাছটা তোমার চেনা গাছ নয়, বাগানের এক কোণে পুঁতে দিও। দেখবে ফলন কম হবে না।

বলেন কী বাবু? এটা কি যাদু গাছ নাকি?

না হে। অনেক মাথা খাটিয়ে এটা আবিষ্কার করতে হয়েছে, এতে পোকামাকড়ও দূরে থাকবে, মাটিও উর্বর হবে।

তা আপনি কোথায় থাকেন বাবু? কোন গাঁ?

কাছাকাছিই থাকি, তবে অন্য সময়ে। ও তুমি ঠিক বুঝবে না।

ভারু বুঝল না ঠিকই, তবে গাছটা জমির এক কোণে পুঁতে দেওয়ার তিন দিনের মধ্যে সে গাছের মহিমা বুঝতে লাগল। সে এক অলৌকিক কাণ্ড, প্রতি সকালে উঠেই সে দেখতে পায় তার তিন বিঘা জমি ফসলে একেবারে টইটম্বুর হয়ে আছে। সব্জীতে সব্জীতে ছয়লাপ। আর সব্জীর সেই খেঁকুড়ে চেহারাও নেই, ফুলকপির আকার বেড়েছে, বাঁধাকপি, বেগুন, মুলো, পালং সবই যেন একেবারে রসে ভরপুর।

পরের হাটবারে সে বাবুটিকে জিজ্ঞেস করল, তা বাবু, গাছটার যখন এতই মহিমা তাহলে আপনি আপনার বাগানে লাগান না কেন? তাহলে তো আর আপনাকে সব্জী কিনতে হয় না।

বাবুটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে উপায় নেই হে। আমি দুশো বছর পরের পৃথিবীতে থাকি, তখন মাটি মরে গেছে। এই যারা এখন কেমিক্যাল সার দিয়ে চাষবাস করে তাদের বোকামিতে। মাটির উর্বরাশক্তি শেষ হয়ে ফলন আর হয় না। ওই মাটিতে এখন আবার প্রাণ সঞ্চার করতে চাষবাস বন্ধ রেখে নানারকম চিকিৎসা করতে হচ্ছে।

বড় বড় চোখ করে শুনছিল ভারু, তাহলে সে তো ভাল কাজই করছে, মাটিতে কেমিক্যাল সার দেয়নি।

বাবু, এই গাছের চারা অন্য কাদেরও দেন না কেন?

লোকটা ম্লান হেসে বলল, তুমি ভাল লোক বলেই কথাটা বললে, তবে কি জানো, ওদের কেমিক্যাল দেওয়া মাটিতে ও গাছ কোনও ক্রিয়া করতে পারে না।

গাছ মরে যাবে। অন্তত পাঁচ-সাত বছর মাটিকে বিশ্রাম দিয়ে তবে ওই গাছ লাগালে কাজ হবে। কিন্তু ততদিন ধৈর্য ধরবে এমন মানুষ কই?

ভারু বলল, তা বটে।

ভদ্রলোক তেমনি তার গাড়িতে উঠে গায়েব হয়ে গেলেন।

তবে ভারুর আর দুঃখ নেই, তার তিন বিঘা জমি থেকে এখন যা আয় হচ্ছে তাতে তার সব দুঃখ ঘুচে গেছে। সব্জী নিয়ে আর বাজার অবধি যেতে হয় না। দুশো বছর পরেকার ভদ্রলোক এখন তার বাড়ি থেকেই সব সব্জী নিয়ে যায়। দরও বাড়িয়ে দিয়েছে তিন গুণ।

দুঃখ শুধু একটাই, তার মতো আর সবাই তেমন সুখে নেই।

গুপ্তধন

ভূতনাথবাবু অনেক ধার-দেনা করে, কষ্টে জমানো যা-কিছু টাকা-পয়সা ছিল সব দিয়ে যে পুরোনো বাড়িখানা কিনলেন তা তাঁর বাড়ির কারও পছন্দ হলো না। পছন্দ হওয়ার মতো বাড়িও নয়, তিন-চারখানা ঘর আছে বটে কিন্তু সেগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। দেয়ালে শ্যাওলা, অশ্বত্থের চারা গজাচ্ছে, দেয়ালের চাপড়া বেশির ভাগই খসে পড়েছে, ছাদে বিস্তর ফুটো-টুটো। মেঝের অবস্থাও ভাল নয়, অজস্র ফাটল। ভূতনাথবাবুর গিন্নি নাক সিঁটকে বলেই ফেললেন, এ তো মানুষের বাসযোগ্য নয়। ভূতনাথবাবুর দুই ছেলে আর তিন মেয়েরও মুখ বেশ ভার ভার। ভূতনাথবাবু সবই বুঝলেন। দুঃখ করে বললেন, আমার সামান্য মাস্টারির চাকরি থেকে যা আয় হয় তাতে তো এটাই আমার তাজমহল। তাও গঙ্গারামবাবুর ছেলেকে প্রাইভেট পড়াই বলে তিনি দাম একটু কম করেই নিলেন। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় এ বাজারে কি বাড়ি কেনা যায়! তবে তোমরা যতটা খারাপ ভাবছো ততটা হয়তো নয়। এ বাড়িতে বহুদিন ধরে কেউ বাস করত না বলে অযত্নে এরকম দুরবস্থা, টুকটাক মেরামত করে নিলে খারাপ হবে না। শত হলেও নিজেদের বাড়ি।

কথাটা ঠিক। এই মহীগঞ্জের মতো ছোটো গঞ্জেও বাড়িভাড়া বেশ চড়া। ভূতনাথবাবু যে বাড়িতে ছিলেন সে বাড়ির বাড়িওলা নিত্যই তাঁকে তুলে দেওয়ার জন্য নানা ফন্দিফিকির করত। মরিয়া হয়েই বাড়ি কেনার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন তিনি।

যাই হোক, বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে, গিন্নি ও পাঁচ ছেলেমেয়ে নিয়ে একদিন ভোরবেলা ভূতনাথবাবু বাড়িটায় ঢুকে পড়লেন। অপছন্দ হলেও বাড়িটা নিজের বলে সকলেরই খুশি-খুশি ভাব। সবাই মিলে বাড়িটা ঝাড়পোঁছ করতে আর ঘর সাজাতে লেগে গেল। ভূতনাথবাবুর ছাত্ররা এসে বাড়ির সামনের বাগানটাও সাফসুতরো করে দিল। কয়েকদিন আগে ভূতনাথবাবু নিজের হাতে গোলা চুন দিয়ে গোটা বাড়িটা চুনকাম করেছেন। তাতেও যে খুব একটা দেখনসই হয়েছে তা নয়, তবে বাড়িতে মানুষ থাকলে ধীরে ধীরে বাড়ির একটা লক্ষ্মীশ্রীও এসে যায়।

আজ আর রান্নাবান্না হয়নি, সবাই দুধ-চিঁড়ের ফলার খেয়ে ক্লান্ত হয়ে একটু গড়িয়ে নিতে শুয়েছে, এমন সময় একটা লোক এল। বেঁটেখাটো, কালো, রোগাটে চেহারা, পরনে হেঁটো ধুতি আর গেঞ্জি। গলায় তুলসীর মালা। ভূতনাথবাবু বারান্দায় মাদুর পেতে শুতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় লোকটা এসে হাতজোড় করে বলল, পেন্নাম হই বাবু, বাড়িটা কিনলেন বুঝি?

হ্যাঁ, তা আপনি কে?

আজ্ঞে আমি হলুম পরানচন্দ্র দাস। চকবেড়ে থেকে আসছি। চকবেড়ের কাছেই গোবিন্দপুরে নিবাস।

অ। তা কাকে খুঁজছেন?

আমাকে আপনি-আজ্ঞে করবেন না। নিতান্তই তুচ্ছ লোক। আপনি বিদ্বান মানুষ। পুরোনো বাড়ি খোঁজা আমার খুব নেশা।

তাই নাকি?

আজ্ঞে, তা বাবু, কিছু পেলেন-টেলেন? সোনাদানা বা হিরে-জহরত কিছু?

ভূতনাথবাবু হেসে ফেললেন, তাই বলো! এইজন্য পুরোনা বাড়ি খুঁজে বেড়াও? না হে বাপু, আমার কপাল অত সরেস নয়, ধুলোবালি ছাড়া আর কিছু বেরোয়নি।

ভাল করে খুঁজলে বেরোতেও পারে। মেঝেগুলো একটু ঠুকে ঠুকে দেখবেন কোথাও ফাঁপা বলে মনে হয় কিনা।

বাড়িতে গুপ্তধন থাকলে গঙ্গারামবাবু কি আর টের পেতেন না? তিনি ঝানু বিষয়ী লোক।

পরান তবু হাল না ছেড়ে বলল, তবু একটু খুঁজে দেখবেন। কিছু বলা যায় না। এ তো মনে হচ্ছে একশ বছরের পুরোনো বাড়ি।

তা হতে পারে।

আর একটা কথা বাবু, তেনারা আছেন কিনা বলতে পারেন?

কে? কাদের কথা বলছো?

ওই ইয়ে আর কি—ওই যে রামনাম করলে যারা পালায়।

ভূতনাথবাবু ফের হেসে ফেললেন, না হে বাপু, ভূতপ্রেতের সাক্ষাৎ এখনও পাইনি। আমার নাম ভূতনাথ হলেও ভূতপ্রেত আমি মানি না।

না বাবু, অমন কথা কবেন না, পুরোনো বাড়িতেই তেনাদের আস্তানা কিনা। আপনি আসাতে তাঁরা কূপিত হলেই মুশকিল।

তা আর কী করা যাবে বলো! থাকলে তাঁরাও থাকবেন, আমিও থাকব।

একটু বসব বাবু? অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছি।

ভূতনাথবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, বোসো বোসো। দাওয়া পরিষ্কারই আছে।

লোকেটা সসঙ্কোচে বারান্দার ধারে বসে বলল, তা বাবু, বাড়িটা কতয় কিনলেন?

তা বাপু, অনেক টাকাই লেগে গেল। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। ধারকর্জও হয়ে গেল মেলা।

উরিব্বাস! সে তো অনেক টাকা।

গরিবের কাছে অনেকই বটে, ধার শোধ করতে জিভ বেরিয়ে যাবে। তা তুমি বরং বোসো, আমি একটু গড়িয়ে নিই। বড্ড ধকল গেছে।

আচ্ছা বাবু, আমি একটু বসে থাকি। ভূতনাথবাবু একটু চোখ বুজতেই ঘুম চলে এল। যখন চটকা ভাঙল তখন সন্ধে হয়-হয়। অবাক হয়ে দেখলেন, পরান দাসও বারান্দার কোণে শুয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

ভূতনাথবাবুর একটু মায়া হলো। লোকটাকে ডেকে তুলে বললেন, তা পরান, তুমি এখন কোথাও যাবে?

পরান একটা হাই তুলে বলল, তাই ভাবছি।

ভাবছো মানে! তোমার বাড়ি নেই?

আছে, তবে সেখানে তো কেউ নেই। তাই বাড়ি যেতে ইচ্ছে যায় না। যা বললুম তা একটু খেয়াল রাখবেন বাবু। পুরোনো বাড়ি অনেক সময় ভারী পয়মন্ত হয়।

লোকটা উঠতে যাচ্ছিল। ভূতনাথবাবু বাধা দিয়ে বললেন, আহা, এই সন্ধেবেলা রওনা হলে বাড়ি যেতে তো তোমার রাত পুইয়ে যাবে বাপু। আজ নতুন বাড়িতে ঢুকলুম, তুমিও অতিথি। থেকেও যেতে পারো। তিন-চারখানা ঘর আছে। বস্তা-টস্তা পেতে শুতে পারবে না?

পরান দাস আর দ্বিরুক্তি করল না, রয়ে গেল। সরল সোজা গাঁয়ের লোক

দেখে ভূতনাথবাবুর গিন্নি বেশি আপত্তি করলেন না। শুধু বললেন, চোরটোর নয় তো?

ভূতনাথবাবু ম্লান হেসে বললেন, হলেই বা আমাদের চিন্তার কী? আমাদের তো দীনদরিদ্র অবস্থা, চোরের নেওয়ার মতো জিনিস বা টাকা-পয়সা কোথা?

পরান দাস কাজের লোক। কুয়ো থেকে জল তুলল, বাচ্চাদের সঙ্গে খেলল, রাতে মশলা পিষে দিল। তারপর একখানা খেঁটে লাঠি নিয়ে সারা বাড়ির মেঝেতে ঠুক ঠুক করে ঠুকে ফাঁপা আছে কিনা দেখতে লাগল। কাণ্ড দেখে ভূতনাথবাবুর মায়াই হলো। পাগল আর কাকে বলে।

খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমোলো। শুধু পরান দাস বলল, আমি একটু চারদিক ঘুরেটুরে দেখি। রাতের বেলাতেই সব অশৈলী কাণ্ড ঘটে কিনা।

মাঝরাতে নাড়া খেয়ে ভূতনাথবাবু উঠে বসলেন, কে?

সামনে হ্যারিকেন হাতে পরান দাস। চাপা গলায় বলল, পেয়েছি বাবু।

অবাক হয়ে ভূতনাথবাবু বললেন, কী পেয়েছো?

যা খুঁজতে আসা। তবে বুড়োকর্তা দেখিয়ে না দিলে ও জায়গা খুঁজে বের করার সাধ্যি আমার ছিল না।

ভূতনাথবাবুর মাথা ঘুমে ভোম্বল হয়ে আছে। তাই আরও অবাক হয়ে বললেন, বুড়োকর্তাটা আবার কে?

একশ বছর আগে এ বাড়িটা তো তাঁরই ছিল কিনা। বড্ড ভাল মানুষ। সাদা ধবধবে দাড়ি, সাদা চুল, হেঁটো ধুতি পরা, আদুর গা, রং যেন দুধে-আলতায়। খুঁজে খুঁজে যখন হয়রান হচ্ছি তখনই যেন দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন।

একটা হাই তুলে ভূতনাথবাবু বললেন, তুমি নিজে তো পাগল বটেই, এবার আমাকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বে দেখছি। যাও গিয়ে শুয়ে একটু ঘুমোও বাপু।

বিশ্বাস হলো না তো বাবু। আসুন তাহলে, নিজের চোখেই দেখবেন।

বিরক্ত হলেও ভূতনাথবাবুর একটু কৌতূহলও হলো।

পরান দাসের পিছু পিছু বাড়ির পিছন দিকে রান্নাঘরের পাশের এঁদো ঘরখানায় ঢুকে থমকে গেলেন। মেঝের ওপর স্তূপাকার ইট, মাটি ছড়িয়ে আছে, তার মাঝখানে একটা গর্ত।

এ সব কী করেছো হে পরান? মেঝেটা যে ভেঙে ফেলেছো।

যে আজ্ঞে, এবার গর্তে একটু উঁকি মেরে দেখুন।

হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় ভূতনাথবাবু গর্তের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলেন একটা কালোমতো কলসি জাতীয় কিছু।

আসুন বাবু, নেমে পড়ুন। বড্ড ভারী, দুজন না হলে টেনে তোলা যাবে না।

ভূতনাথবাবুর হাত-পা কাঁপতে লাগল উত্তেজনায়। বললেন, কী আছে ওতে?

তুললেই দেখতে পাবেন। আসুন বাবু, একটু হাত লাগান।

ভূতনাথবাবু নামলেন। তারপর মুখঢাকা ভারী কলসিটা দুজনে মিলে অতি কষ্টে তুললেন ওপরে। পরান একগাল হেসে হেসে বলল, এবার খুলে দেখুন বাবু আপনার জিনিস।

বেশ বড় পিতলের কলসি। মুখটায় একটা ঢাকনা খুব আঁট করে বসানো। শাবলের চাড় দিয়ে ঢাকনা খুলতেই চকচকে সোনার টাকা এই হ্যারিকেনের আলোতেও ঝকমক করে উঠল।

বলেছিলুম কিনা বাবু! এখন দেখলেন তো। যান, আপনার আর কোনও দুঃখ থাকল না। দু'তিন পুরুষ হেসেখেলে চলে যাবে।

ভূতনাথবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এরকমও হয়! পরানের দিকে চেয়ে বললেন, এসব সত্যি তো! স্বপ্ন নয় তো!

না বাবু, স্বপ্ন নয়। বুড়ো কর্তার সব কিছু এর মধ্যে। এত দিনে গতি হলো।

ভূতনাথবাবু পরানকে জড়িয়ে ধরে বললেন, পাগল হলেও তুমি খুব ভাল লোক। এর অর্ধেক-তোমার।

পরান সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলল, ওরে বাবা, ও কথা শুনলেও পাপ। টাকা-পয়সায় আমার কী হবে বাবু?

তার মানে? এত মোহর পেয়েও নেবে না?

না বাবু, আমার আছেটা কে যে ভোগ করবে? একা বোকা মানুষ, ঘুরে ঘুরে বেড়াই, বেশ আছি। টাকা-পয়সা হলেই বাঁধা পড়ে যেতে হবে।

ভূতনাথবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, তাহলে গুপ্তধন খুঁজে বেড়াও কেন?

আজ্ঞে, ওইটে আমার নেশা। খুঁজে বেড়ানোতেই আনন্দ। লুকোচুরি খেলতে যেমন আনন্দ হয় এও তেমনি। আচ্ছা আসি বাবু। ভোর হয়ে আসছে, অনেকটা পথ যেতে হবে।

পরান দাস চলে যাওয়ার পর ভূতনাথবাবু অনেকক্ষণ বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ভাবলেন, একটা সামান্য লোকের কাছে হেরে যাবো? ভেবে কলসিটা আবার গর্তে নামিয়ে মাটি চাপা দিলেন। ওপরে ইঁটগুলো খানিক সাজিয়ে রাখলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে একটু হাসলেন।

হনুমান ও নিবারণ

নিবারণবাবু শান্তিপ্রিয় মানুষ। কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই। উটকো উৎপাত তিনি পছন্দ করেন না। তবু তাঁর কপালেই হালে এক ঝামেলা এসে জুটেছে। বাড়ির সামনেই একখানা পেল্লায় জাম গাছ। সেই গাছে দু-তিন দিন আগে হঠাৎ কোথা থেকে এক বিশাল জাম্বুবান কেঁদো হনুমান এসে থানা গেড়েছে। এ তল্লাটে হনুমান বাঁদর ইত্যাদি কোনও কালেই ছিল না। হনুমানটা যে কোথা থেকে উটকো এসে জুটলো তা কে জানে!

তা হনুমান আছে থাক, নিবারণবাবুর তাতে বিশেষ আপত্তি নেই। হনুমান হনুমানের মতো থাক, তিনি থাকবেন তাঁর মতো। কিন্তু এই ব্যাটাচ্ছেলে হনুমান কি করে যেন টের পেয়েছে যে, এ পাড়ায় সবচেয়ে নিরীহ ভালমানুষ হলো এই নিবারণ ঘোষাল। হতচ্ছাড়া আর কাউকে কিছু বলে না, কারও দিকে দৃষ্টিপাত অবধি নেই। কিন্তু নিবারণবাবু বাড়ি থেকে বেরোলেই জাম গাছে তুমুল আলোড়ন তুলে হুপহাপ-দুপদাপ করে দাপাদাপি করতে থাকে।

প্রথম দিনের ঘটনা। শান্ত শরৎকালের মনোরম সকাল। সোনার থালার মতো সূর্য উঠেছে। চারদিকে একেবারে আহ্লাদী রোদ। একখানা কোকিলও কুহুস্বরে ডাকছিল। নিবারণবাবু থলি হাতে প্রশান্ত মনে বাজার করতে বেরিয়েছিলেন। দুর্গা নাম স্মরণ করে চৌকাঠের বাইরে সবে পা রেখেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ জাম গাছটায় ওই তুমুল কাণ্ড। নিবারণবাবু সভয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তিনি ভারী ভিতু লোক।

গিন্নি বললেন, কী হলো, ফিরে এলে কেন?

নিবারণবাবু আমতা আমতা করে বললেন, জাম গাছে কী যেন একটা কাণ্ড হচ্ছে।

গিন্নি হেসে বললেন, ও তো একটা হনুমান। কাল আমিও দেখেছি। পাড়ার ছোকরারা ঢিল মারছিল।

নিবারণবাবু একটা নিশ্চিন্দির শ্বাস ফেলে বললেন, তাই বলো! হনুমান!

জাম গাছতলা দিয়েই রাস্তা আর রাস্তা দিয়ে মেলা লোক যাতায়াত করছে। দুধওয়ালা, কাগজওয়ালা, বাজারমুখো এবং বাজারফেরৎ মানুষ, ঝাড়ুদার। হনুমান কাউকে দেখেই উত্তেজিত নয়, কিন্তু যেই নিবারণবাবু ফের দরজার বাইরে পা দিয়েছেন অমনি লম্ফঝম্ফ শুরু হয়ে গেল।

নিবারণবাবু তখন সাহসে ভর করে একটু দৌড় পায়েই জাম গাছটা পেরিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু কেমন একটা অস্বস্তি রয়ে গেল মনের মধ্যে।

তবে সেদিন বাজারে গিয়ে মনটা ভারী ভাল হয়ে গেল।

সস্তায় বেশ বড় বড় পাবদা মাছ পেয়ে গেলেন। মরশুমের প্রথম ফুলকপি একটু দর করতেই দাম নেমে গেল, আর এক আঁটি ধনেপাতা কিনে ফেললেন মাত্র চার আনায়। বাজার সেরে যখন ফিরছেন তখন আর হনুমানটার কথা তাঁর খেয়াল নেই।

যেই আনমনে জাম গাছটার কাছাকাছি এসেছেন অমনি ডালপালায় তুমুল শব্দ করে হনুমানটা নেমে এল একেবারে নিচে। একখানা ডাল ধরে এমন ঝুল খেতে লাগল যে তার লেজখানা নিবারণবাবুর নাকের ডগা ছোঁয়-ছোঁয়। নিবারণবাবু জীবনে দৌড়ঝাঁপ বিশেষ করেননি, তবু হনুমানের হামলা থেকে বাঁচার জন্য সেদিন এমন দৌড় দিলেন যে তাঁর ছোটো ছেলে বিশু অবধি পরে প্রশংসা করে বলেছিল, বাবা তুমি যদি সিরিয়াসলি দৌড়োতে তাহলে অলিম্পিক থেকে প্রাইজ আনতে পারতে।

চটি পরা পা আর বাজারের ব্যাগ নিয়ে যে কেউ অমন দৌড়োতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হতো না।

দৌড়টা যে ভালই হয়েছিল তা নিবারণবাবুও জানেন, তবে শেষ অবধি চটিজোড়া পায়ে ছিল না, ছিটকে পড়েছিল। আর বাজারের ব্যাগ হাতছাড়া হয়ে সাধের পাবদা মাছ চারটে কাকে নিয়ে গেল, ছ'খানা ডিম ভাঙল আর রাস্তার একটা গরু দু'খানা ফুলকপি চিবিয়ে খেয়ে নিল।

দ্বিতীয়বার ঘটনাটা ঘটল অফিসে বেরোনোর সময়। নিস্তব্ধ জাম গাছতলা দিয়ে বিস্তর লোক বিষয়কর্মে যাচ্ছে আসছে। কিন্তু টিফিনকৌটো নিয়ে ছাতা বাগিয়ে গালে পানটি পুরে দুর্গানাম স্মরণ করে যেই নিবারণবাবু বেরোলেন অমনি জামগাছে যেন ঝড় উঠল। হনুমানটা এ ডাল-ও ডালে ভীষণ লাফালাফি করতে করতে হুপহাপ করে বকাঝকাই করতে লাগল বোধহয়।

কিন্তু অফিস তো আর কামাই করা যায় না, নিবারণবাবু ছাতাখানা ফট করে খুলে তার নিচে আত্মগোপন করে প্রাণপণে দৌড় লাগালেন। কিন্তু স্পষ্ট টের পেলেন, জাম গাছটা পেরোনোর সময় হনুমানটা তাঁর ছাতায় একটা খাবলা মারল।

গত তিনদিন ধরে নিবারণবাবুর জীবনে আর শান্তি নেই। আসতে হনুমান, যেতে হনুমান। হনুমানটা কেন যে শুধু তাঁর পিছনেই লাগছে তা চিন্তা করে তিনি হয়রান। খেতে পারছেন না, ঘুমোতে পারছেন না, তিনদিনেই বেশ রোগা হয়ে গেছেন। তাঁর দুই ছেলে কানু আর বিশু হনুমানটাকে তাড়ানোর জন্য বিস্তর ঢিল আর গুলতি ছুঁড়েছে, তাদের সঙ্গে পাড়ার ছেলেরাও। কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি। হনুমানটা গাছের মগডালে উঠে ঘন ডালপালার মধ্যে চুপচাপ বসে আছে। ইট-পাটকেল তার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারেনি।

গিন্নি বললেন, পূর্বজন্মে ও তোমার ভাই ছিল, তাই এত টান।

নিবারণবাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, হনুমানের ভাই হতে আমি যাবো কেন?

দুশ্চিন্তা নিয়েই নিবারণবাবু রাতে শুয়েছেন। তবে ঘুম আসছে না। মাথাটা বেশ গরম। কাল সকালেই আবার বাজার আছে, অফিস আছে। জাম গাছতলা ছাড়া যাওয়ার পথ নেই। শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছেন। কিছুদিনের ছুটি নিয়ে পুরী বা ওয়াল্টেয়ার ঘুরে আসবেন কিনা তাও ভাবছেন।

হঠাৎ একটা বিকট হুপ শব্দে নিস্তব্ধ রাতটা যেন কেঁপে উঠল। নিবারণবাবু চমকে উঠে বসলেন আতঙ্কে। অন্ধকার ঘর, তবু জানালার দিকে চেয়ে তাঁর বুক হিম হয়ে গেল। জানালাটা অর্ধেক ভেজানো ছিল। এখন জানালাটা পুরো খোলা। আর গ্রিল ধরে সেই অতিকায় হনুমানটা দাঁড়িয়ে। দুখানা চোখ ভাটার মতো জ্বলছে।

ভয়ে এমন সিঁটিয়ে গেলেন নিবারণবাবু যে, কাউকে ডাকতে পারলেন না, গলা দিয়ে স্বরই বেরোলো না তাঁর। কিছুক্ষণের জন্য যেন পাথর হয়ে গেলেন। হঠাৎ

একটা বেশ ভরাট গমগমে গলা বলে উঠল, ভয় পাবেন না....ভয়ের কিছু নেই...

বিস্ময়ে হতবাক নিবারণবাবু কে কথা বলল তা চারদিকে চেয়ে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে কারও থাকার কথা নয়।

কণ্ঠস্বরটি ফের বলে উঠল, রামচন্দ্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি তাঁর দূত মাত্র।

নিবারণবাবু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। স্বপ্ন দেখছেন কিনা তা বুঝবার জন্য হাতে একখানা রাম চিমটি কেটে নিজেই উঃ করে উঠলেন।

গলাটা বলল, স্বপ্ন নয়। যা দেখছেন, যা শুনছেন সব সত্যি।

নিবারণবাবু হনুমানের দিকে চেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, কথাগুলো কি আপনিই বলছেন? মানুষের ভাষায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের হাতে সময় বিশেষ নেই। রামচন্দ্র অপেক্ষা করতে ভালবাসেন না।

রামচন্দ্র কে?

আমার প্রভু।

কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে?

আপনি আমার সঙ্গে যাবেন।

ও বাবা! আমি পারব না, আমার বড় ভয় করছে।

ভয় কিসের?

আমার ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে ঠেকছে।

গোলমালের কিছু নেই। চলে আসুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

নিবারণবাবু বুঝলেন, এসব ভুতুড়ে কাণ্ড। এবং বেশ জবরদস্ত ভূতের পাল্লায় তিনি পড়েছেন। তবে এখনও উদ্ধারের উপায় আছে। তিনি ঘুমন্ত গিন্নিকে প্রবল ধাক্কা দিয়ে জাগাতে জাগাতে কানু আর বিশুকে প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন। সে এমন রামধাক্কা আর বিকট চেঁচানি যে মরা মানুষেরও উঠে বসবার কথা। কিন্তু কোনও সাড়াশব্দই পেলেন না।

হনুমান বলল, ওদের ঘুম এখন ভাঙবে না। বৃথা চেঁচামেচি করছেন।

ভয়ে নিবারণবাবুর শরীর প্রথমে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন তার ভয়ে আবার কলকল করে গাম হতে লাগল।

বুকের ভিতরটা এমন ধড়ফড় করছে যে, হার্ট ফেল হওয়ার যোগাড়।

ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, এসব আমার ভাল লাগছে না।

নিবারণবাবু শুয়ে পড়ে জোর করে চোখ বন্ধ করে রইলেন।

হনুমান বলল, নিবারণবাবু প্রভুর হুকুম তালিম না করে আমার উপায় নেই। আপনি সহজে না গেলে জোর করে নিয়ে যেতে হবে।

এই বলে হনুমান চুপ মারল। নিবারণবাবু চোখ মিটমিট করে দেখতে পেলেন, হনুমান দু'হাতে গ্রিল ধরে টানাটানি করছে। শক্ত লোহার গ্রিল, ভাঙতে পারবে বলে মনে হলো না নিরারণবাবুর।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হনুমান মাত্র একটা হ্যাঁচকা টানেই পুরো গ্রিলটা জানালার ফ্রেম থেকে উপড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল।

নিবারণবাবু এত ভয় পেয়েছেন যে, আরও বেশি ভয় পাওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। মজা হলো ভয় যখন সাঙ্ঘাতিক বেশি হয় তখন মানুষের একটা মরিয়া সাহসও আসে। চোর তাড়ানোর জন্য খাটের মাথার কাছে একখানা মোটা বেতের লাঠি রাখা থাকে। আজ অবধি সেটা কোনও কাজে লাগেনি। আজ লাগল। নিবারণবাবু ভাবলেন, এমনিতেও গেছি, অমনিতেও গেছি, সুতরাং আর ভয়ের কী? যা থাকে কপালে—

ভেবে লাফিয়ে উঠে তিনি লাঠিটা নিয়ে প্রবল বিক্রমে হনুমানের মাথায় বসিয়ে দিলেন। কিন্তু বসালেও লাঠিটা ঠিকমতো বসল না। হনুমান খুব আলগা হাতে লাঠিটা কেড়ে নিল হাত থেকে, তারপর সেটাকে প্যাঁকাটির মতো ভেঙে ফেলে বলল, কেন ঝামেলা করছেন? প্রভু রামচন্দ্র ডাকছেন, এ আপনার মহা সৌভাগ্য।

নিবারণবাবু যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হনুমানটা লম্বায় প্রায় তাঁর সমান। আর চওড়ায় কুস্তিগীরদের মতো। এত বড় হনুমান তিনি এর আগে আর দেখেননি। বিপদে পড়ে মাথাটা একটু গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি হনুমানের কথাগুলো শুনেও বুঝবার চেষ্টা করেননি। এবার তাঁর হঠাৎ মনে হলো, এ কি সেই রামচন্দ্রের হনুমান নাকি? হনুমান তো অমর, তার এখনও পৃথিবীতে বেঁচেবর্তে থাকবার কথা। আর প্রভু রামচন্দ্র তিনি তো স্বয়ং ভগবান। তাহলে এসব হচ্ছেটা কী? রামচন্দ্র তাঁর ভক্ত হনুমানকে পাঠিয়েছেন তাঁকে ডাকবার জন্য? কিন্তু কেন? তিনি তো তেমন উঁচুদরের ভক্ত বা ধার্মিক নন।

হনুমান জলদগম্ভীর গলায় বলল, আমার লেজটা ধরুন।

ভয়ে ভয়ে নিবারণবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে লেজটা ধরলেন। আর ধরতেই যেন চৌম্বক আকর্ষণে হাতদুটো লেজের সঙ্গে আটকে গেল। আর দাঁড়ানোর উপায় রইল না।

তারপর যে কী হলো তা নিবারণবাবু ঠিক বুঝতে পারলেন না। হনুমান তাঁকে জানালা গলিয়ে বাইরে এনে ফেলল এবং তারপর ইনজিনের মতো ছুটতে শুরু করল। এত ছুট জীবনের কখনও ছোটেননি নিবারণবাবু। তবে কেন যেন তার হাঁফ ধরছিল না। চোখের পলকে নিজেদের তল্লাট এবং শহর ছাড়িয়ে খোলা মাঠঘাটে এসে গেলেন তাঁরা। হনুমান মস্ত মস্ত লাফ মেরে ঢেউয়ের মতো চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিবারণবাবুও ঢেউ হয়ে বয়ে যাচ্ছেন। প্রায় বারো হাত দূরে দূরে এক-একবার পা মাটিতে ঠেকছে।

অনেকটা চলে আসার পর একটা জঙ্গলে ঢুকে গেলেন তাঁরা। তারপর একটা ফাঁকা চত্বর। জঙ্গলঘেরা জায়গাটায় একটা লোক পিছনে হাত রেখে মৃদুমন্দ পায়চারি করছে। লোকটা বেঁটে এবং দেখতে একটু কিম্ভূত। পরনে একটা পাশবালিশের ওয়াড়ের মতো পোশাক, মাথায় একটা সরু টুপি। লোকটার গোল মুখখানায় চোখ নাক কান কোনওটাই ঠিক জায়গায় নেই বলে মনে হলো দূর থেকে।

কাছে গিয়ে হনুমান লোকটাকে প্রণাম করে বলল, প্রভু এনেছি।

লোকটা নিবারণের দিকে ফিরে তাকাল, মুখটা ভাল করে দেখে আঁতকে উঠলেন নিবারণবাবু। এর চোখ দু'টো দুই গালে। ঠোঁট দু'টো নাকের ওপরে। আর গলা বলে কিছু নেই। কানদু'টো গরুর কানের মতো।

এই কি রামচন্দ্র? এত বিচ্ছিরি দেখতে?

রামচন্দ্র লোকটা ডান গালের চোখটা দিয়ে নিবারণবাবুকে দেখে নিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, পেন্নাম করলে না?

যে আজ্ঞে। বলে নিবারণবাবু তাড়াতাড়ি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ভয়ে ভয়ে প্রণাম করলেন।

রামচন্দ্র খকখক শব্দ করে হেসে বললেন, শোনো হে বাপু, আমি সত্যিই তোমাদের রামায়ণের রামচন্দ্র নই। তার গল্পটা বেশ লাগে, তাই ভাবলুম রামচন্দ্র নামটা নিলে মন্দ হয় না।

আপনি আসলে কে তাহলে?

লোকটা মাথাটা একটু নেড়ে বলে, সে বাপু অনেক কথা। তবে সোজা কথায় আমি এ তল্লাটের লোক নই, এই দেশের নই, এমনকি এই হতচ্ছাড়া নোংরা গ্রহেরও নই। অনেক দূরের পাল্লা রে বাপু। আর আমার এই হনুমানটিও আসল হনুমান নয়। কলের হনুমান। তবে কল হলেও ও বড় খুঁতখুঁতে, সবাইকে পছন্দ করে না। দুনিয়া ঘুরে ঘুরে মাত্র একটা লোককেই ও বেছে বের করেছে। সে হলো তুমি।

নিবারণবাবু ঘন ঘন চোখ কচলাচ্ছিলেন। প্রত্যয় হচ্ছে না। যা শুনছেন সব সত্যি নাকি? এসব তো কল্প-বিজ্ঞানে থাকে।

রামচন্দ্র বলল, তোমাদের গ্রহটা নোংরা হলেও মহাকাশে আমার কাজের পক্ষে সুবিধেজনক। আমার হনুমানকে তাই তোমাদের গ্রহে পাকাপাকিভাবে রেখে যেতে চাই। সমস্যা হলো, ওকে ঠিকমতো দেখাশুনা করার লোক চাই। ও তোমাকে খুঁজে বের করেছে, কাজেই ওর ভার তোমাকেই নিতে হবে।

নিবারণবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, যে আজ্ঞে, তবে কেমন যত্নআত্তি করতে হবে?

খুব সোজা, ওর মাথায় একটা ছোট্ট ফুটো আছে, চাঁদির একেবারে মাঝখানে।

এই তেলের কৌটোটা নাও, মাসে একবার ওই ফুটোর মধ্যে দুফোঁটা তেল ঢেলে দিলেই হবে। আর তোমার বাড়ির জাম গাছটাতেই ও থাকবে। ওকে যেন কেউ বিরক্ত না করে দেখো। বেশি বিরক্ত করলে কিন্তু ও গা থেকে এমন রশ্মি বের করতে পারে যা তোমাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

নিবারণবাবু শিউরে উঠে বললেন, যে আজ্ঞে।

আর তুমি ইচ্ছে করলে ওকে ফাইফরমাস করতে পারো, ওর সঙ্গে হিল্লি-দিল্লি বেড়িয়ে আসতে পারো।

নিবারণবাবু স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন, যে আজ্ঞে।

তাহলে এসো গিয়ে। কোনওরকম গোলমাল কোরো না কিন্তু।

আজ্ঞে না।

লোকটা অর্থাৎ রামচন্দ্র গটগট করে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা শিস দিল। অমনি মাটির তলা থেকে একটা কিম্ভূত পটলাকৃতি মহাকাশযান বেরিয়ে এল। লোকটা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই জিনিসটা সাঁ করে আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল।

নিবারণবাবু এখন বেশ আছেন। হনুমানটা জাম গাছেই থাকে। তবে তাকে আর ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বরং মাঝরাতে হনুমানটা এসে তাঁর সঙ্গে দিব্যি আড্ডা দিয়ে যায়। ঘরের কাজকর্মও অনেক করে দেয়। গিন্নি তো পছন্দ করেনই, বিশু আর কানুরও সে বেশ বন্ধু হয়ে গেছে।

হনুমানকে তেল দিতে নিবারণবাবুর একবারও ভুল হয় না।

উল্কা ও ষষ্ঠীচরণ

ষষ্ঠীচরণ পায়চারি করছিল। আর পায়চারি করতে বেশ ভালোও লাগছিল তার। তবে কাজটা যত সহজ শোনাচ্ছে ততটা নয়। আসলে সে পাহারায় আছে। পায়চারি করতে করতে তাকে বিশেষ নজরও রাখতে হচ্ছে। তার ওপর বহু মানুষের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে। একটু ভুলচুক হলেই বা নজরদারিতে গাফিলতি ঘটলেই অতি বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে যাবে।

তার কানে হেডফোন লাগানো আছে। ঘ্যানাবাবু হচ্ছেন অপারেশন ম্যানেজার। ফোনে হঠাৎ তাঁর হেঁড়ে গলা শোনা গেল, বলি, ওহে ষষ্ঠীচরণ, ঘুমিয়ে পড়োনি তো!

আজ্ঞে না স্যার, দিব্যি জেগে আছি।

হুঁশিয়ার থেকো হে, উল্কাটার মতিগতি খুব ভালো ঠেকছে না। ব্যাটা চাঁদের পিছনে ঘাপটি মেরে আছে বলে মনে হচ্ছে। দূরেই আছে এখনও, তবে যে কোনও সময়ে এসে পড়তে পারে।

চিন্তা করবেন না স্যার, আমি নজর রাখছি।

তুরপুনটা রিলিজ করার সময় হলেই তোমাকে সিগন্যাল দেবো। ভগবানের নাম করে ছেড়ো হে, বড্ড সাবধানে কাজ করতে হবে।

যে আজ্ঞে, শুধু একটা কথা স্যার।

কথা! কী কথা বলে ফেল।

আজ্ঞে, আমার প্রমোশনটা অনেকদিন আটকে আছে।

আরে, ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। তুমি আগে রাক্ষসটাকে তো আটকাও। কাজটা উদ্ধার হলে বরদাবাবু খুশি হবেন। তখন তোমারও হিল্লে হয়ে যাবে।

যে আজ্ঞে।

ষষ্ঠীচরণ ফের পায়চারি করতে থাকে। অন্যমনস্ক হলে চলবে না। ঘুম পেলে চলবে না। ভুলচুক হলে চাকরি যাবে। ষষ্ঠীচরণ গরিব মানুষ, চাকরি গেলে খুব সমস্যায় পড়ে যাবে। আর সেইজন্য সে পায়চারির গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়।

অসুবিধের ব্যাপার হল, সে পায়চারি করছে মহাশূন্যে একটি বিশাল কৃত্রিম স্যাটেলাইটের পিঠের ওপর। কোমরে অবশ্য ধাতব দড়ি বাঁধা আছে স্যাটেলাইটের সঙ্গে। ছিটকে যাওয়ার ভয় নেই। আর পায়ে আছে বিশেষ ধরনের সোলওয়ালা

জুতো যাতে পা স্যাটেলাইটের সঙ্গে সেঁটে থাকে। স্যাটেলাইটের ওপর একটা মাউন্ট করা হারপুন। হারপুনের ডগায় ওয়ারহেড লাগানো। এই অস্ত্র দিয়েই নচ্ছার উল্কাটাকে টিট করতে হবে। ষষ্ঠীচরণ খুবই ভালো তীরন্দাজ। উল্কাটার গতিবিধি কিছু বিচিত্র বলে শুধু যন্ত্র দিয়ে লক্ষ্যভেদের ওপর নির্ভর না করে ষষ্ঠীচরণকে ডাকা হয়েছে। হারপুনটা যন্ত্রের সাহায্যেই নিক্ষেপ করা হবে বটে, তবে ষষ্ঠীচরণ প্রয়োজনে যন্ত্রটাকে সাহায্য করবে।

কানে লাগানো ফোনে তার গাঁ মুকুন্দপুর থেকে মায়ের গলা পাওয়া গেল। ও বাবা ষষ্ঠীচরণ, কখন থেকে আকাশে ঝুলে আছিস বাবা, বলি কিছু খেয়েছিস? পেটে দানাপানি কিছু পড়েছে?

হ্যাঁ মা, এরা বেশ ভালো খাইয়েছে। মাংস, ভাত, রসগোল্লা।

তবে যে শুনি, আকাশে নাকি পাতের ভাত মাছ সব পাত ছেড়ে উড়ে উড়ে বেড়ায়। খেলি কি করে?

সে অনেক ব্যবস্থা আছে। টিউবে করে খাবার দেয়। টুথপেস্টের মতো টিপে টিপে বের করে খেতে হয়।

ও আবার কিরকম অলুক্ষুণে খাওয়া?

সেই খাওয়া খুব মজার, গিয়ে সব বলবখন।

তা হ্যাঁ বাবা ষষ্ঠী, কতটা ওপরে উঠেছিস বল তো!

সে অনেক ওপরে মা, কয়েক শো মাইল তো হবেই!

ও বাবা, তাহলে স্বর্গের কাছাকাছিই হবে বোধ হয়। তা ওখান থেকে স্বর্গের বাগান-টাগান দেখা যায়? শিব, দুগ্গা কাউকে দেখলি বাবা? দেখলে পেন্নাম-টেন্নাম করিস। আর আমাদের দুঃখ-দুর্দশার কথাও একটু জানিয়ে রাখিস।

স্বর্গ বোধহয় আরও ওপরের দিকটায় হবে। ঠিক আছে ঠাকুর-দেবতা কাউকে দেখলে বলবখন।

দেখিস বাবা, পা পিছলে পড়ে-টড়ে যাসনি। অত ওপর থেকে পড়লে হাত-পা ভাঙবে।

না মা, পড়ার কোনও ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও।

দুর্গা দুর্গা। তা সেই মুখপোড়া উল্কাটা কি এখনও আসেনি?

না মা, তবে এল বলে, আর দেরি নেই।

মাকে বেশি জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই। মা জানে আকাশের ওপর দিকটায় স্বর্গ। প্রকৃত আকাশ কি বস্তু তা মা জানে না, জেনে আর দরকারও নেই।

উদ্বিগ্ন মুখে আকাশের দিকে চেয়ে ষষ্ঠীচরণ উল্কাটার গতিবিধি নজরে আনার চেষ্টা করছিল। চাঁদটা খুবই কাছে। মাথার ওপর এত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যেন হাত

বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। আর বিরাট বড়ও লাগছে চাঁদকে।

হঠাৎ তার কানে লাগানো ফোনে একটা বাজখাঁই গলা একেবারে ফেটে পড়ল, বলি ষষ্ঠীচরণ, শুনলুম দেনার দায়ে জেরবার হয়ে এখন ফাঁকি দেওয়ার তালে আকাশে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছো। ওতে কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। চিরকাল তো আর ঝুল খেয়ে থাকতে পারবে না বাবা। ত্রিশ হাজার টাকার দেনা এখন সুদে-আসলে গিয়ে তেষট্টি হাজার সাতশো বাহাত্তরে দাঁড়িয়েছে। এক মাসের মধ্যে শোধ না দিলে ঘটি-বাটি চাটি করে ছাড়ব। বুঝেছো?

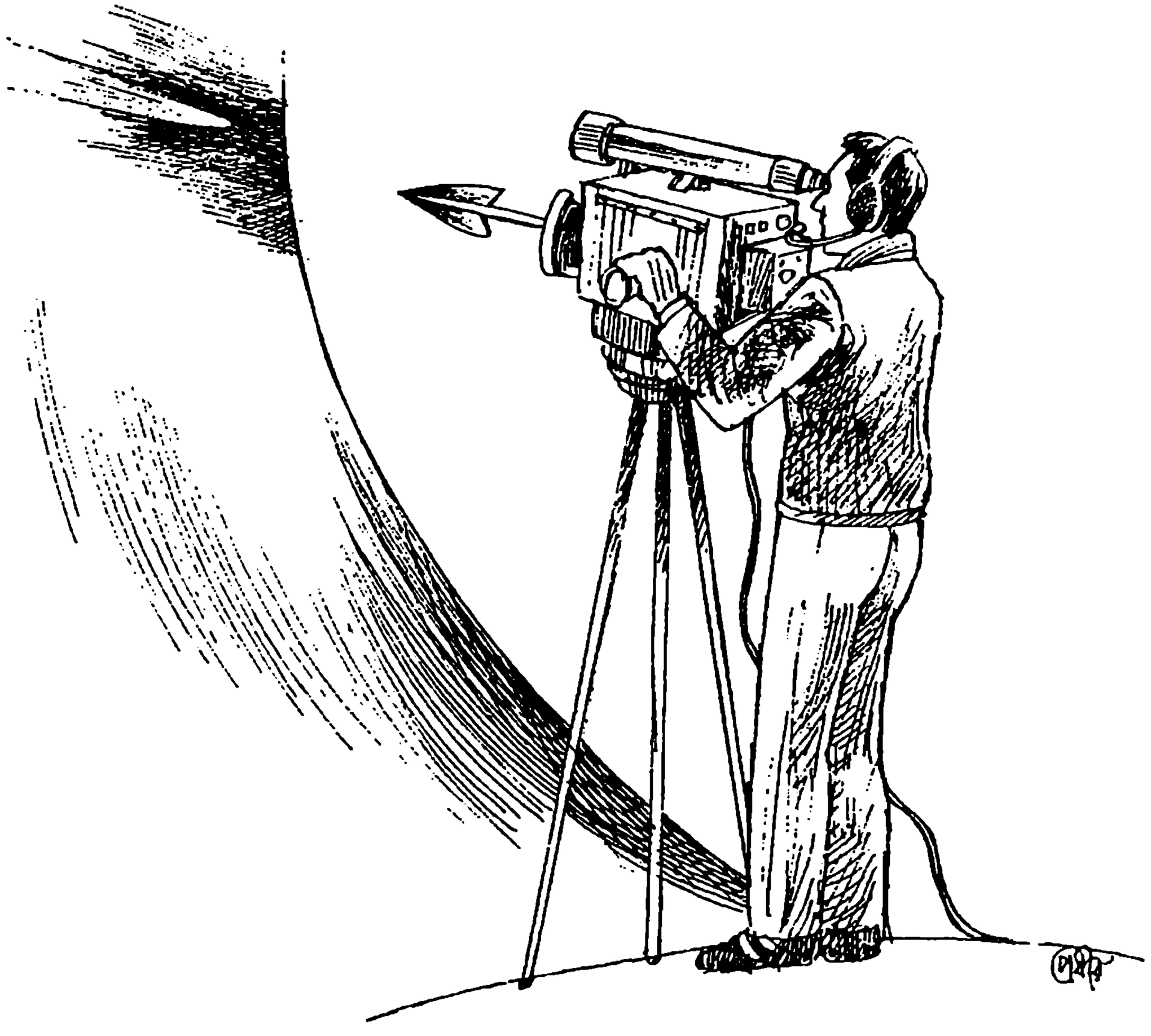

ষষ্ঠীচরণ খুব বুঝেছে। বিগলিত ভাব দেখিয়ে ভারী বিনয়ের সঙ্গে বলল, ভাববেন না নগেনবাবু, টাকাটা ঠিকই দিয়ে দেবো। কয়েকটা দিন একটু অসুবিধের মধ্যে আছি। কাঁচা বাড়িতে মা-বাবার বড্ড অসুবিধে হচ্ছিল বলে বাড়িটা পাকা করতে হল কিনা।

মনে রেখো বাপু, জমির দলিল আমার কাছে বাঁধা রেখেছো, টাকা ঠিকমতো শোধ না দিলে জমি নিয়ে নেবো। এখন আইন বহুৎ কড়া।

যে আজ্ঞে, জমি গেলে আমরা খাবোই বা কী বলুন!

আকাশ থেকে নেমে তো এসো, তারপর মজাটা টের পাবে।

নগেনবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই হরিপদ সাহার ফোন।

বলি ও ষষ্ঠী, আকাশে উঠে কি হাতে চাঁদ পেয়েছো নাকি হে? আমার দোকানে কত বাকি ফেলেছো জানো? দু'হাজার তিনশো তেইশ টাকা, বুঝলে? আর বাপু, ধারবাকিতে মাল দেওয়া আমার পোষাবে না, বলে দিলুম পষ্ট করে। আমার সাফ কথা, ফেলো কড়ি মাখো তেল।

ভারী কাকুতি-মিনতি করে ষষ্ঠীচরণ বলে, আর দুটো দিন সবুর করুন হরিপদবাবু, আমি ফিরে গিয়েই ধার মিটিয়ে দেবো। বাকিতে মাল না দিলে যে আমার বুড়ো বাপ-মা না খেয়ে মরবে।

না বাপু, আমিও ছাপোষা মানুষ, মুদির দোকান থেকেই আমারও সংসার চালাতে হয়। আর বাকিতে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আর তিনটে দিন হরিবাবু, দেখতে দেখতে কেটে যাবে, এলুম বলে।

দেখো বাপু, কথার নড়চড় না হয়।

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল ষষ্ঠীচরণের। মা-বাপ আর ভাই ও বোনদের সে বড় ভালোবাসে। কিন্তু তারা বড়ই গরিব। সে মহাকাশ গবেষণাগারের সামান্য টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট। সামান্য বেতনে সংসার চালাতে পারে না। সে ক্রস বোতে তীরন্দাজী শিখেছিল এক সাহেবের কাছে। তাতে একসময়ে তার একটু নামও হয়েছিল।

কিছুদিন আগে আকাশের এক কোণে একটা বড়সড় উল্কার সন্ধান পায় মার্কিন আর রুশ বিজ্ঞানীরা। হিসেবনিকেশ করে দেখা গেছে সেটা পৃথিবীতে এসে পড়বে। এবং পড়বে ভারতবর্ষেরই কোথাও। কিন্তু মার্কিনীদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন খুব খারাপ বলে উল্কাটাকে মহাকাশে অনেক দূরে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যাপারে মার্কিনীরা মোটেই গা করেনি। কিন্তু বহু দূরে রকেট পাঠিয়ে উল্কাটাকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার টেকনোলজি মার্কিনী ছাড়া আর কারও নেই। রুশরা একসময়ে ভারতের বন্ধু ছিল বটে, কিন্তু ইদানীং তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে লক্ষ্মী লাভ করে সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে। মহাকাশ নিয়ে চর্চাতেও তারা বিশেষ আগ্রহী নয়। তবে ভারত গরিব দেশ হলেও মহাকাশ গবেষণায় খুব একটা পিছিয়ে নেই। সুতরাং তারা নিজেরাই এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করছে। তবে তাদের আন্তর্জাতিক মহাকাশ দূষণ দফতর থেকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে উল্কাটা ধ্বংস করতে তারা যেন বিস্ফোরক ব্যবহার না করে। কারণ মহাকাশে এখন কয়েক হাজার কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে নানা উচ্চতায় ঘুরপাক খাচ্ছে। বিস্ফোরকে তাদের ক্ষতি হতে পারে। তাই আপাতত শক্তিশালী হারপুন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবং কম্পিউটার দিয়ে তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এই যন্ত্র ব্যবহারের সবচেয়ে

উপযুক্ত লোক ষষ্ঠীচরণ। কারণ সে ক্রস বো তীরন্দাজীতে খুবই পাকা।

আর সেজন্যই ষষ্ঠীচরণ আজ মহাকাশে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত। কিন্তু ষষ্ঠীচরণ বারবারই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। বড় অনটনের সংসার। এ কাজটা সফলভাবে করতে পারলে হয়তো তার প্রমোশনটা হবে। কিছু পুরস্কারও পাওয়া যেতে পারে। বাড়ি বাবদ কুড়ি লাখ টাকা ব্যাংকের ধার খানিকটা যদি শোধ দেওয়া যায়। তার চারদিকেই শুধু পাওনাদার।

কানে লাগানো ফোনে অরোরা সাহেবের গলা পাওয়া গেল, আরে এই বুরবক ষষ্ঠীচরণ, তু কিয়া খোয়াব মে হো? আরে উও খতরনাক মিটিওর তো তুরন্ত আ রাহা হ্যায়। গেট রেডি ম্যান।

ষষ্ঠীচরণ তাকিয়ে দেখে সত্যিই চাঁদের পিছন থেকে বেশ বড় একটা মেটে সোনালী রঙের গোলা ছুটে আসছে। তীব্র গতি। একটু বাদেই সেটা পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ঢুকে জ্বলে উঠবে। তারপর সোজা গিয়ে মধ্যভারতের কোথাও আছড়ে পড়ে বিশাল এলাকা ধ্বংস করে দেবে। হারপুন ঠিকমতো গেঁথে দিতে পারলে ওটার মাথায় যে একটা ওয়ারহেড লাগানো আছে তাতে সোনিক বুম সৃষ্টি হয়ে উল্কাটিকে বহু খণ্ডে টুকরো করে দেবে। আর সেই টুকরোগুলো পৃথিবীতে পড়ার আগেই আবহমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

ষষ্ঠীচরণ তার হারপুন ঘুরিয়ে তৎপর হল। এখন একটু অন্যমনস্ক হলেই সর্বনাশ।

উল্কাটা এত দ্রুত আসছে যে লক্ষ্য স্থির করাই কঠিন। ষষ্ঠী হারপুনে শুয়ে টেলিস্কোপিক ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে একটু অবাক হয়ে গেল। উল্কাটা সাধারণ জিনিস নয়। ঠিক অপরিশোধিত সোনার মতো পাটকিলে সোনালী রং। আড়ে-দীঘে প্রায় সিকি কিলোমিটার তো হবেই।

ষষ্ঠীচরণ খুব ঠাণ্ডা মাথায় দূরত্বটা মেপে নিল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল। সে জানে সরাসরি বস্তুটাকে লক্ষ্য করে রিলিজ বাটন চাপলে কাজ হবে না, কারণ হারপুন গিয়ে লাগবার আগেই উল্কা জায়গাটা পেরিয়ে যাবে। সুতরাং হারপুন ছাড়তে হবে কয়েক সেকেণ্ড আগে উল্কার সম্ভাব্য গতিপথের দিকে তাক করে।

কানে লাগানো ফোনে একটা মিঠে গলা শোনা গেল, রামরাম ষষ্ঠীবাবু, ভালো আছেন তো! তবিয়ৎ তন্দুরস্ত আছে তো! বলছিলাম কি, আপনাকে আমি তিন লাখ রুপিয়া দিব, আপনি উল্কাটাকে ছোড়িয়ে দিন।

ষষ্ঠী অবাক হয়ে বলে, সে কী! কেন বলুন তো!

হামার ঝুনঝুনওয়ালা ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা এখুন খারাপ যাচ্ছে। ক্যালুকুলেশন করে দেখলাম উল্কাটা যেখানে এসে পড়বে সেখানে হামার দশটা গো-ডাউন আছে। গো-ডাউনের সব মাল সরিয়ে নিয়ে তিন ক্রোর রুপিয়ার ইনসিওরেন্স করিয়ে দিয়েছি।

উল্কাটা পড়লে হামার কিছু সুবিধা হবে। আপনার ওয়ান পারসেন্ট।

ষষ্ঠী নিবিষ্ট চোখে উল্কাটাকে লক্ষ্য করতে করতে বলল, ঝুনঝুনবাবু আপনি কি জানেন যে, আপনি খুব খারাপ লোক?

হাঁ হাঁ, কিঁউ জানব না! সবাই জানে, কিন্তু ভগওয়ানই তো আমাকে ভি পয়দা করেছেন। খারাপ লোকেরও কি দরকার নাই ষষ্ঠীবাবু? খারাপ লোকরাও তো সোসাইটিকে সারভিস দিচ্ছে, ঠিক কিনা বলুন?

উল্কাটা ভয়ংকর গতিবেগে চাঁদ পেরিয়ে চলে আসছে। ষষ্ঠী দাঁতে দাঁত পিষে ফোনটা অফ করে দিয়ে একাগ্র হল। গতিপথটা অনুমানে স্থির করে নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে লাগল, সবটাই তার নিজস্ব পদ্ধতিতে। তীরন্দাজ হিসেবে তার পক্ষে যতটা সম্ভব নির্ভুল একটা দূরত্ব স্থির করে সে হারপুনের ট্রিগার টিপে দিল। একটা তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে মসৃণ গতিতে হারপুনটা বেরিয়ে গেল নিক্ষেপ যন্ত্র থেকে।

উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে চেয়ে রইল ষষ্ঠীচরণ, রুপোলি রঙের বিশাল লম্বা হারপুনটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কালো আকাশ চিরে ছুটছে বিদ্যুতের গতিতে। ওদিক থেকে মেটে সোনার রঙের উল্কাটাও আসছে ভয়ংকর গতিতে। লাগবে তো! হে ভগবান! ক্যালকুলেশন যথাসাধ্য নির্ভুলই হয়েছে বলে তার ধারণা। কিন্তু

হারপুনটা লাগল, ষষ্ঠীচরণ যেখানে অবস্থান করছে তার খুব কাছেই ঘটল ঘটনাটা, খুব বেশি হলে আধ-কিলোমিটারের তফাতে। হারপুনটা সোজা গিয়ে উল্কার পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই সোনিক বুম চালু হয়ে গেল। আকস্মিক আঘাতে উল্কাটা কি একটু দোল খেল? গতি ব্যাহত হল একটু? পরমুহূর্তে একটা অপূর্ব নিঃশব্দ বিস্ফোরণে কালো আকাশে যেন ছড়িয়ে পড়ল ফুলঝুরির রংবেরং। শত খণ্ডে বিচূর্ণ হয়ে নানা দিকে ছিটকে যেতে লাগল বিদীর্ণ উল্কার টুকরোগুলো।

ষষ্ঠীচরণ ভারী তৃপ্তমুখে দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দেখছিল। মুখে একটু বোকাবোকা হাসি। আর ওইটেই ভুল করেছিল সে। কথা ছিল, উল্কাটিকে ভেঙে দেওয়ার সময় সে সটান শুয়ে পড়বে, যাতে কোথাও বিপদ না ঘটে। খেয়াল ছিল না ষষ্ঠীর। হঠাৎ একটা বড়সড় টুকরো ছিটকে এসে সে কিছু বুঝে উঠবার আগেই যেন বিরাশি সিক্কার একটা চড় মেরে শুইয়ে দিল তাকে। ষষ্ঠী জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল স্যাটেলাইটের পিঠের ওপর।

যখন জ্ঞান হল তখন সে কলকাতার এক হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। চারপাশে সব হোমরাচোমরা মানুষ। এক ভারিক্কি ওপরওয়ালা বলল, বহোৎ খুব ষষ্ঠী, বাহাদুর হো।

আর একজন বলল, জোর বেঁচে গেছ হে। শ্র্যাপনেলটা প্রায় শেষ করে দিয়েছিল তোমাকে।

ষষ্ঠী হাতজোড় করে বলল, আজ্ঞে আমার মা-বাবার আশীর্বাদ আর ভগবানের দয়া।

তা তো বটেই। সরকার বাহাদুর তোমাকে পঞ্চাশ লাখ টাকা পুরস্কার দেবে, বুঝেছো।

পঞ্চাশ লাখ!

শুধু তাই নয়। উল্কাটা ছিল পুরো সোনার। যে টুকরোটা এসে তোমার গায়ে লেগেছিল সেটার ওজন বাহাত্তর কেজি, ওটাও তোমাকে দেওয়া হবে।

ষষ্ঠী ফের অজ্ঞান হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ

পতিতপাবনের দুটো গুণ। সে ভারী ভাল সাইকেল চালায় আর দুর্দান্ত ফুটবল খেলে। সাইকেল সে এতই ভাল চালায় যে, একবার মহামায়া সার্কাস তাকে সাইকেলের খেলা দেখানোর জন্য চাকরি অবধি দিতে চেয়েছিল। আর ফুটবলের কৃতিত্বও তার এতই সুবিদিত যে, কলকাতার ভাল-ভাল ক্লাব তাকে টানাটানি করতে লেগেছে। পতিতপাবনের অবশ্য বেশি বড় হওয়ার লোভটোভ নেই। সে খেলে বা সাইকেল চালিয়ে আনন্দ পায় আর তাইতেই সে খুশি।

হেমন্তের এক বিকেলে পতিতপাবন কুসুমপুরে তার বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। চার মাইল দূরে নয়াগঞ্জে আজ তার শীতলাষষ্ঠী ক্লাবের সঙ্গে গঙ্গাধরপুরে যুবকবৃন্দ ক্লাবের মধ্যে তারাময়ী স্মৃতি শিল্ডের ফাইনাল খেলা। তারাময়ী হলেন নয়াগঞ্জের জমিদার হরিকিশোরের স্বর্গগতা ঠাকুমা। শুধু শিল্ড নয়, বিজয়ী দলের প্রত্যেককে হরিকিশোর পাঁচশো টাকা করে পুরস্কার দেন, শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে এক ভরির সোনার মেডেল। তাছাড়া রাতের ভূরিভোজ তো আছেই। শীতলাষষ্ঠী ক্লাব গত তিন বছর তারাময়ী স্মৃতি শিল্ড জিতেছে আর পতিতপাবন তিনবারই পেয়েছে নিরেট সোনার মেডেল।

এবারও জিততে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। শীতলা ক্লাবের সবাই ভাল খেলে। পতিতের তাই দুশ্চিন্তা নেই। সে শিস দিতে দিতে সাইকেল চালাচ্ছিল।

জয়দেবের মোড় অবধি ফাঁকা রাস্তা। বেশ জোরেই চালাচ্ছিল সে। মোড়ের কাছ-বরাবর তার হঠাৎ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জেগে উঠল। মনে হল বাঁ ধার থেকে একটা কালো মোটরগাড়ি যেন বড্ডবেশি গতিতে এগিয়ে আসছে। পতিত গাড়িটা এক ঝলক নজর করে মনে মনে হিসেব করে নিল, গাড়িটা মোড় পর্যন্ত আসার আগেই সে মোড়টা ঠিক পেরিয়ে যাবে। গতিটা একটু বাড়িয়েও দিল পতিত।

সাধারণ নিয়মে মোড়টা গাড়ির আগেই পেরোনোর কথা পতিতের। কিন্তু কালো গাড়িটা যেন পতিতকে ধরবে বলে হঠাৎ স্পিড বাড়িয়ে দিল।

ঘটনাটা ঘটছিল মোড়ের কাছাকাছি। জনমনিষ্যি ছিল না রাস্তায়। গাড়িটারও ভীম গতি দেখে বিপদ বুঝে সাইকেলের ব্রেক চেপেও ধরেছিল পতিত। কিন্তু সাইকেলকে রোখা গেল না। গাড়িটা বাঁ দিক থেকে ধেয়ে এসে সোজা পেল্লায় ধাক্কা মারল সাইকেলে।

পতিতের আর কিছু মনে নেই।

যখন চোখ মেলল তখন সে একটা গাড়ির সামনের সিটে বসে আছে। পাশে

একজন বেশ সুদর্শন ভদ্রলোক গাড়ি চালাচ্ছেন বসে। তাকে চোখ চাইতে দেখে ভদ্রলোক বললেন, "এই যে, কেমন আছ?"

মাথাটা আবছা লাগছে। কী হয়েছিল তা মনে পড়ছিল না পতিতের। সে বলল, "ভালই আছি।"

"শরীরে ব্যথাট্যথা নেই তো?"

"না। কিন্তু আপনি কে?"

"আমার নাম নির্জন সেন।"

"আমি গাড়িতে বসে আছি কেন?"

"তোমার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।"

"তাই নাকি! কীভাবে হল?"

"অত জানি না। দেখলাম তুমি রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছ, তাই তুলে নিলাম।"

"ও। কিন্তু আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি? হাসপাতালে নাকি?"

"না। হাসপাতালে যাওয়ার মতো কিছু হয়নি তোমার।"

সামনে বিরাট চওড়া মসৃণ পাকা রাস্তা। অদ্ভুত সব গাড়ি উলটো দিক থেকে এসে পেরিয়ে যাচ্ছে সাঁ সাঁ করে। অবশ্য বাইরের কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না গাড়িতে বসে।

পতিত হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আমরা কোথায় যাচ্ছি যেন!"

"ফুটবল খেলতে।"

"ওঃ, তাই বলুন।"

"তুমি যে ফুটবল খেলো তা মনে আছে তো?"

"আছে। কিন্তু আর কিছু মনে নেই।"

"আর কিছু মনে রাখার দরকারটা কী? শুধু ফুটবলটা মনে রাখলেই হবে।"

"তাই নাকি? আচ্ছা, আমার বাড়ি কোথায়?"

"বাড়ির কথা ভাবছ?"

"না। আসলে আমার কিছু মনেই পড়ছে না।"

"এরকমটাই তো ভাল। মনখারাপ নয় তো?"

"নাঃ।"

"তোমার বাড়িটাড়ি কিছু নেই।"

"বাঃ, বেশ তো! এই শহরের নাম কী?"

"শহর! শহর কোথায় দেখছ? এটা তো একটা রাস্তা।"

"ওঃ, তাই তো। খেলাটা কোথায় হবে?"

"স্টেডিয়ামে। আর মাত্র দশ মাইল।"

"সেখানে কারা খেলবে?"

"দুটো ক্লাব। ক আর খ।"

"বাঃ, সুন্দর নাম। আমি কোন দলে খেলব?"

"খ দলে। আজকের খেলাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট।

"সব খেলাই ইম্পর্ট্যান্ট, তাই না?"

"ঠিক বলেছ। সব খেলাই ইম্পর্ট্যান্ট। তবে আজকের খেলার একটা আলাদা গুরুত্ব আছে।"

"কেন বলুন তো?"

"খ দলের সবাই নতুন। কেউ কাউকে চেনে না। আজই তারা প্রথম একসঙ্গে খেলবে।"

"বাঃ, বেশ মজা তো!"

"তোমাদের জার্সির রং নীল। ক দলের জার্সি লাল। মনে থাকবে?"

সামনেই গাছপালার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ মস্ত স্টেডিয়ামটা দেখা গেল।

"ওটা কী?"

"ওটাই স্টেডিয়াম। এক লক্ষ লোক ধরে।"

"এত লোক।"

"হ্যাঁ। স্টেডিয়াম আজ কানায় কানায় ভরা।"

"কিন্তু হইচই নেই তো?"

"না। আজকাল হইচই হয় না। সবাই মন দিয়ে খেলা দেখে, নোট নেয়, চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করে। হইচই হবে কেন?"

কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হল পতিতের কাছে। সে বলল, "ঠিকই তো।"

নির্জন সেন গাড়িটা স্টেডিয়ামের সিঁড়ির নীচে একটা ফটকের সামনে এনে দাঁড় করালেন।

চারদিকে একটা ঝলমলে ভাব। একটা মস্ত ড্রেসিং রুমে তাকে এনে দাঁড় করিয়ে নির্জন সেন বললেন, "আর পনেরো মিনিটের মধ্যে খেলা শুরু হবে। ড্রেস আপ করে নাও। বুট, জার্সি সব গোছানো আছে। তৈরি হয়ে বেরিয়ে এসো। ওয়ার্ম আপ করার জন্য পাঁচ মিনিট সময় পাবে। আজ খ দলের মস্ত পরীক্ষা।"

লক্ষ্মী ছেলের মতো আদেশ পালন করল পতিত। তারপর বেরিয়ে এল। নির্জন সেন দরজার বাইরেই ছিলেন। তাকে নিয়ে মাঠের ধারে এসে বললেন, "বাঁ ধারেরটা ক দল। ডান ধারে খ। রাইট আউটের জায়গাটা খালি দেখছ তো! ওটাই তোমার পজিশন। যাও, নামো।"

পতিত নামল।

বিশাল মাঠ, সবুজও বটে, কিন্তু মাঠে পা দিয়েই পতিত বুঝতে পারে, পায়ের নীচে মাটি নয়, একটা কৃত্রিম আস্তরণ। কিন্তু পতিতের তাতে কিছু ইতরবিশেষ মনে হল না।

কাদের বিরুদ্ধে সে খেলছে এবং সহখেলোয়াড়রাই বা কারা তা সে জানে না। কিন্তু তাতেও তার কোনও অসুবিধে হল না। সে এটাও লক্ষ করল, মাঠে রেফারি বা লাইন্সম্যান নেই। একপাশে একটা বিশাল বোর্ডে একটা ইলেকট্রনিক ঘড়িতে দেখাচ্ছে। খেলা শুরু হতে আর পনেরো সেকেণ্ড বাকি।

একটা মিষ্টি বাঁশি অলক্ষ্যে বেজে উঠল। বিপক্ষ ক দল সেন্টার করে খেলা শুরু করে দিল।

পতিত কিছুক্ষণ বল যেদিকে-সেদিকে লক্ষ করে দৌড়তে লাগল। তাকে বুঝতে হবে খেলাটা কোন গতিতে হচ্ছে এবং কোন কায়দায়। তার খ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে যে বোঝাপড়া নেই এবং ক দল যে অতি সুসংবদ্ধ তা বুঝতে তার লহমাও লাগল না। সেন্টারের পর ক দলের খেলুড়েরা দুর্দান্ত গতিতে নিজেদের মধ্যে পাস খেলে এগিয়ে যাচ্ছে। খ দলের হাফলাইন বরাবর তারা লোক বাড়িয়ে নিয়ে খেলাটা

বাঁ দিকে উইং-এ নিয়ে যাচ্ছে। অতি, অতি দ্রুত তাদের পায়ের কাজ, নির্ভুল মাপা পাস এবং নিখুঁত জায়গা দখল। এত ভাল ফুটবল খেলা পতিত কখনও দেখেনি, তুলনায় তাদের দলকে ছন্নছাড়া, বিপর্যস্ত এবং হতচকিত মনে হচ্ছে।

বাঁ দিকের উইং থেকে ক দলের লেফ্‌ট আউট অতি অনায়াসে দু'জনকে কাটিয়ে বল ঠেলে দিল। ফরওয়ার্ডের একজন এগিয়ে গিয়ে সেটা গোলে প্লেস করে দিল। ১—০।

না, মাঠে কোনও চেঁচামেচি হল না, উল্লাসধ্বনি নয়। খেলা শুরুর তিন মিনিটের মধ্যে গোল। রেফারির বাঁশি বাজল। পতিত বুঝতে পারল খেলা পরিচালিত হচ্ছে নেপথ্য থেকে। সম্ভবত কম্পিউটারই এ-খেলায় রেফারি।

এবার তাদের সেন্টার। নিজেদের খেলোয়াড়দের একটু চিনে নিচ্ছে পতিত, দশ নম্বর জার্সি পরা লোকটাকে চেনা-চেনাও লাগছিল তার। সেন্টারের পর সেই দশ নম্বর লোকটা বল নিয়ে খুব মসৃণ গতিতে ক দলের গোলের দিকে এগোচ্ছিল। দু'জনকে ডাইনে-বাঁয়ে মাইনাস করে দিল ছবির মতো। তার পর বল বাড়াল ডান দিকে। একজন বলটা ধরতে যেতেই ক দলের একজন ঈগলের মতো বলটা তুলে নিল পায়ে। তারপর ফের অনবদ্য এবং সঙ্ঘবদ্ধ সেই চোখধাঁধানো খেলা। গতি, ছন্দ, নির্ভুল আদান-প্রদান। দশ মিনিটের মাথায় ক দল দু' নম্বর গোল করে ফেলল। এরকম চললে নব্বই মিনিটে দশ-বারো গোল খেতে হবে। কিন্তু পতিতের কী করার আছে তা বুঝল না। একটা ছন্নছাড়া দল একটা সঙ্ঘবদ্ধ দলের বিরুদ্ধে খেললে তো এরকমই হওয়ার কথা।

দ্বিতীয়বার সেন্টারের পর দশ নম্বর খেলুড়ে হঠাৎ বলটা পতিতের দিকে বাড়িয়ে দিল। পতিত বলটা ট্র্যাপ করে লাইন বরাবর ছুটতে লাগল। এই প্রথম বল পেয়েছে, বেশ টগবগ করছিল সে। একজন বাধা দিতে আসছিল, তাকে একটা হাফ টার্নে কাটিয়ে একটু ভেতরে ঢুকে আবার লাইনের দিকে সরে গেল সে। কর্নার ফ্ল্যাগের কাছবরাবর বলটা সেন্টার করতে যেতেই একজন অতি তৎপর প্রতিপক্ষ অতি অবিশ্বাস্য শারীরিক দক্ষতায় শূন্যে লাফিয়ে তার শট করা বল পায়ে নামিয়ে নিয়ে ক্লিয়ার করে দিল। বোকার মতো পতিত দেখল, খেলাটা ওরা আবার ধরে নিয়েছে।

তৃতীয় গোলটা অবধারিতই ছিল। ডান ইনসাইড খেলোয়াড়ের কামানের গোলার মতো শটটা খ দলের লম্বা গোলকিপার অবশ্য ঝাঁপ খেয়ে বুকে জাপটে নিয়ে বাঁচিয়ে দিল। তবে তিন নম্বর গোলটা হল আরও পাঁচ মিনিট খেলা চলার পর। ডান ধার থেকে একটা বুলেটের মতো ফ্রি কিকে।

ক দল সারাক্ষণ চেপে আছে। খ দল হিমসিম খাচ্ছে ঘর সামাল দিতে। বল তারা ছুঁতেই পাচ্ছে না ভাল করে। পতিত এবং অন্য সব ফরওয়ার্ডরা নীচে নেমে এসেছে প্রতিরোধ করতে। আক্রমণ গেছে চুলোয়।

ফের ওই দশ নম্বর লোকটা বল পেল। পেয়েই এক আশ্চর্য পায়ের জাদুতে ক দলের তিনজন খেলোয়াড়কে পর পর কাটিয়ে নিয়ে চিতা বাঘের মতো মাঝমাঠ পেরিয়ে ছুটছে। লোকটা একা। পতিতও তাই লঘু পায়ে তীব্র গতিতে বাঁ ধার ধরে ছুটতে লাগল।

দশ নম্বরের সামনে প্রতিপক্ষের তিনজন পজিশন নিচ্ছে, দু'জন পাশে পাশে দৌড়ে আসছে, আর একজন ডিপ ডিফেন্স থেকে আসছে কোনাকুনি। লোকটার পক্ষে অতিমানব হলেও এই জাল কেটে বেরোনো অসম্ভব।

পতিত যা আশা করেছিল তাই হল, লোকটা হঠাৎ বলটা তার দিকে ঠেলে দিল। পতিত বাঁ পায়ে বলটা নামিয়ে লাইন বরাবর একটু ছুটতেই গোটা ডিফেন্স তার দিকে ধেয়ে আসছিল। পতিত দেওয়াল টপকে বলটা ফেলল দশ নম্বরের পায়ে। দশ নম্বর বলটা ধরলই না, চলতি বলে বাঁ পায়ে চকিতে একটা ভলি মারল, যে ভলি দেখার জন্য লাখ টাকা খরচ করা যায়। বলটা যেন একটা বিদ্যুৎঝলকের মতো গোলে ঢুকে জালে ঢেউ তুলে দিল। ৩—১।

দশ নম্বর এগিয়ে এসে তার হাতটা নেড়ে দিয়ে বলল, "ওয়েল ডান।"

লোকটা কে বুঝতে পারছিল না সে। কিন্তু মুখটা চেনা-চেনা ঠেকছে।

দশ নম্বর দ্বিতীয় গোলটা করল ভগবানের মতো। প্রতিপক্ষ সেন্টার করার পরই লোকটা একজন প্রতিপক্ষের পা থেকে বলটা আলতো টোকায় তুলে নিল, তারপর বুক আর কাঁধের ওপর বলটাকে এক অলৌকিক দক্ষতায় নাচাতে-নাচাতে দৌড়ে যেতে লাগল। তারপর ডান আর বাঁ পায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডজ। ইনস্টেপ, আউটস্টেপ দিয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে লোকটা একা টেনে নিয়ে গেল বলটাকে। তারপর অত্যাশ্চর্য সেই গোলটা করল বলটা বাঁ পায়ে একটু তুলে কোমরের সমান উঁচু থেকে চাঁটানো শটে। সেই শটের এত জোর যে বলটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু জালটা অনেকটা ফুলে উঠল সেই বলের গতিতে।

দু'গোলের পর খ দলের বিপর্যস্ত ভাবটা কেটে একটা ছন্দ এল। ধীরে ধীরে খেলাটা ধরতে পারছে তারা।

পতিত বলটা পেল দ্বিতীয় গোলের পাঁচ মিনিটের মধ্যে। মাঝমাঠ থেকে সে বল ধরে ছুটতে-ছুটতে দশ নম্বরকে বল বাড়াল। কিন্তু দশ নম্বরকে ওরা প্রায় ঘিরে ফেলেছে। বুঝতে পেরেছে, এ অতি বিপজ্জনক খেলোয়াড়। দশ নম্বর তাই বলটা ফের ফিরিয়ে দিল পতিতকে। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে বলে পতিত বলটা ছাড়ল না। লাইন ছেড়ে হঠাৎ ডান দিকে একটা প্যারাবোলা রচনা করে সে হরিণের গতিতে তিনজন প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে নিল। সহজ শট নিতে একটু দ্বিধা করল সে। গোলরক্ষকটি বুদ্ধিমান। সুতরাং সে বলটা একটু তুলল, মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিল একটা বিপজ্জনক হাফভলি। এ শট সে ভালই মারে। গোলকিপার হাঁ করে

দেখল, বল জালে।

ছ'নম্বর গোলটা এল ঠিক দু'মিনিট পর। সেই দশ নম্বর। রাইট আউটের সঙ্গে পাস খেলে এগিয়ে সেন্টার থেকে ডাইভিং হেড-এ।

খেলা শেষ। কোনও হাফটাইমের বালাই নেই। খেলা শেষ হতেই ক দলের খেলোয়াড়রা কোন রন্ধ্রপথে বেরিয়ে গেল কে জানে। দাঁড়িয়ে শুধু খ দলের খেলোয়াড়রা।

অর্জুন সেন এগিয়ে এসে তাদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। একটু হেসে বললেন, "আপনাদের একটু কষ্ট দিয়েছি। এ খেলাটা হল আপনাদের সময়ের বহু বহু বছর পর। বিভিন্ন যুগ থেকে আমরা এক-একজন খেলোয়াড়কে তুলে এনেছি। কাউকে একশো, কাউকে দেড়শো, কাউকে দুশো বা আড়াইশো-তিনশো বছর আগে থেকে। এই দু'হাজার তিনশো এক খ্রিস্টাব্দে আপনাদের খেলা আমরা রেকর্ড করে নিলাম। ফুটবলকে উন্নত করার জন্য এই ঘটনাটার দরকার ছিল।"

সবাই নির্বাক। বলে কী লোকটা!

অর্জুন সেন এগিয়ে এসে দশ নম্বর খেলোয়াড়ের হাত ধরে বললেন, "ধন্যবাদ পেলে, আপনার খেলা আমাদের মুগ্ধ করেছে।"

পেলে! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না পতিত।

অর্জুন এগিয়ে এসে তাকে বললেন, "তুমিও দারুণ খেলেছ, আমি যে-সময় থেকে তোমাকে তুলে এনেছি তখনও তোমার নামডাক তেমন হয়নি। কিন্তু পরবর্তী কালে তুমি বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় হয়েছিলে। আমরা তোমার ওই কম বয়সের খেলাই দেখতে চেয়েছিলাম। যাকগে, এবার তোমাদের ফেরার পালা। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে তার সময়কার পাঁচ লক্ষ টাকা বা সমমানের ডলার বা পাউন্ড পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে। আশা করি আমাদের কথা সকলের মনে থাকবে।"

অর্জুন সেন তার গাড়িতেই ফিরিয়ে দিলে গেলেন পতিতকে। সেই মোড়ের কাছে।

"ওই তোমার সাইকেল। আর ওই তোমার সময়। নিজের সময়ে ফিরে যাও পতিত। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করো।"

একটু রাত হয়ে গেছে। শিল্ডের ফাইনালে খেলতে পারেনি পতিত, কিন্তু তার জন্য দুঃখ নেই। তার বদলে অভিজ্ঞতা বড় কম হল না। কিট ব্যাগে পাঁচ লাখ টাকাও কি সোজা কথা।

সাইকেল চালিয়ে পতিত বাড়ি ফিরতে লাগল।